

মহাকবি মাইকেল

মহাকবি মাইকেল

'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র', 'কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র', 'বাংলার শহীদ',
'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী

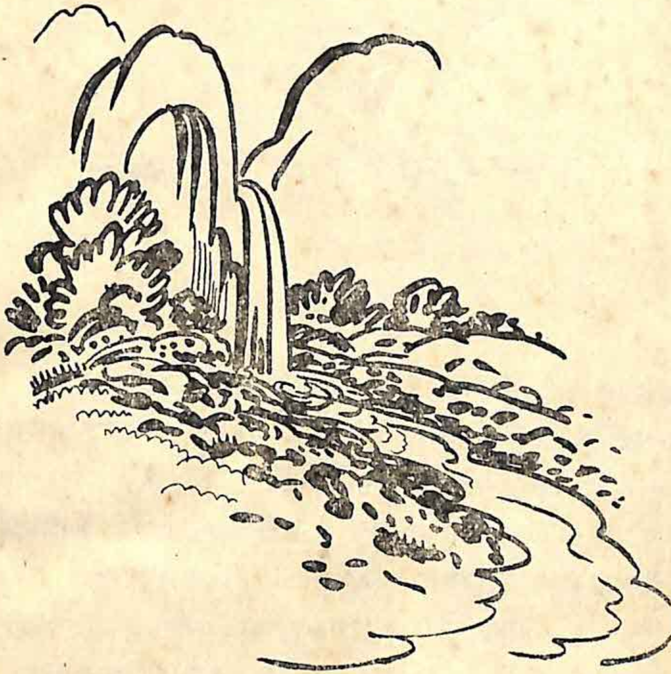
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

*

* *

দাম : এক টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং ১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড, সাধারণ প্রেস লিঃ হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক মুদ্রিত।



মহাকবি মাইকেল

এক

যশোহর জেলায় সাগরদাঁড়ী নামে একটি গ্রাম আছে। যশোহর হইতে এই গ্রামটি আটাশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কপোতাক্ষী নদী ইহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানের বিখ্যাত দত্তবংশে বাংলা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ, ইংরেজী ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী 'মেঘনাদবধ'-কাব্যরচয়িতা অমরকবি মধুসূদন জন্ম গ্রহণ করেন।

মধুসূদনের পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতার নাম জাহ্নবী দেবী। জাহ্নবী দেবী খুলনা জেলার কাটপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। মধুসূদনের মাতুলবংশও তাঁহার পিতৃবংশের ন্যায় খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। জাহ্নবী দেবী স্নেহ-পরায়ণতা, দানশীলতা, আশ্রিতবাৎসল্য, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় গুণবতী মহিলা তৎকালে বঙ্গসমাজে অতি বিরল ছিল বলিলে বেশি বলা হয় না। তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন এবং আমোদপ্রমোদে অর্থ ব্যয় করিতে কখনও কার্পণ্য করিতেন না। স্বামিসেবাকে তিনি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। মধুসূদন

যেমন সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণ পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ হৃদয়ের সরলতা, উদারতা, কোমলতা, প্রেমপ্রবণতা প্রভৃতি গুণসমূহও লাভ করিয়াছিলেন মাতার নিকট হইতে। মধুসূদন যেরূপ কতকগুলি পিতৃগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন, সেইরূপ কতকগুলি দোষও উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। পিতার বুদ্ধিমত্তা, বাক্‌পটুতা, বিদ্যানুরাগ, সহৃদয়তা যেমন তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পিতার বিলাসপরায়ণতা, অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি দোষগুলিও সম্যক্‌রূপেই লাভ করিয়াছিলেন।

ফারসী ভাষায় রাজনারায়ণ দত্তের অগাধ পারদর্শিতা ছিল। এই জন্য তিনি মুন্‌সী রাজনারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং কবিত্বশক্তিসম্পন্ন না হইলেও, কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। আগমনী এবং বিজয়া-সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। মধুসূদনের কবিত্বশক্তি পরোক্ষভাবে পিতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত। যে সৌন্দর্য্যপিপাসা মধুসূদনের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল, তাহা তিনি পিতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধিবলে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকিল হইয়াছিলেন। এই ব্যবসায়ে তিনি অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ উকিল সদর আদালতে অতি অল্পই ছিল। রাজনারায়ণ তাঁহার উপার্জ্জিত সমুদয় অর্থই মুক্তহস্তে দান করিয়া ফেলিতেন। দানশীলতা ছিল তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব।

মধুসূদনের পিতার চারি বিবাহ। জাহ্নবী দেবী জীবিত থাকিতেই রাজনারায়ণ আরও তিনটি বিবাহ করেন। জাহ্নবী দেবীই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা পত্নী।

মধুসূদন যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন সাগরদাঁড়ীর দত্ত-বংশের খুব সচ্ছল অবস্থা। সুতরাং মধুসূদনের জাতকর্ম্মাদি খুব সমারোহের সহিতই সম্পন্ন হইয়াছিল। বিশেষতঃ চারিভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠের পুত্র বলিয়া মধুসূদনের আদরের সীমা ছিল না।

মধুসূদনের জন্মগ্রহণের চারিবৎসরের মধ্যেই তাঁহার অপর তুইটি ভ্রাতার জন্ম হয়, কিন্তু অতি শৈশবেই তাঁহারা কালগ্রাসে পতিত হন। এই তুইটি ভ্রাতার অকালমৃত্যুতে এবং অপর ভ্রাতা-ভগিনীর অভাবে মধুসূদন পিতা, মাতা, পিতৃব্য ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের একান্ত আদরের পাত্র ছিলেন। যেরূপ আদরে ও যত্নে মধুসূদনের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, সাধারণতঃ রাজপুত্রদের ভাগ্যেও তদ্রূপ ঘটে না। অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রশ্রয় দিতেন। তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হইত, তখনই তিনি তাহা করিতেন, কেহ তাহাতে বাধা দিত না। শৈশবে এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়াই মধুসূদন বাল্য হইতেই স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেইজন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি আর আত্মসংযম অভ্যাস করিতে পারেন নাই।

জাহ্নবী দেবী মধুসূদনকে এত ভালবাসিতেন যে, তিনি তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিতেন না। মধুসূদন

পাঠশালায় গেলে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত জননী ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার আগমনপথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন।

মধুসূদনের শৈশবে হৃদয় এত স্নেহপ্রবণ ছিল যে, বাড়ীর দাসদাসীকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাহারা মধুসূদনের নিকট কখনও কোনও জিনিস বা পুরস্কার চাহিয়া ব্যর্থমনোরথ হইত না। প্রতিবাসিগণের মধ্যে কাহারও কোনও অভাব দেখিলে মধুসূদন সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতেন।

দুই

মধুসূদনের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তাঁহার পিতা কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। খিদিরপুর অঞ্চলে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি তথায় বাস করিতেন। মধুসূদন জননীর সহিত সাগরদাঁড়ীতেই বাস করিতেন।

গ্রামের পাঠশালাতেই মধুসূদনের বিদ্যারম্ভ হয়। পড়াশুনার দিকে মধুসূদনের একান্ত অনুরাগ ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায়, যাহারা ধনীর সন্তান বা যাহারা শৈশবে গুরুজনদিগের নিকট হইতে অধিকতর প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, অধ্যয়নের দিকে তাহাদের প্রায়ই অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মধুসূদনের চরিত্রে এই দোষ স্পর্শ করে নাই। অধ্যয়নাসক্তি ও কাব্যানুরাগ —এই দুইটি গুণ মধুসূদনের চরিত্রে শৈশব হইতেই বিকশিত হইয়াছিল। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি পড়াশুনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা। হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়েও তাঁহার এই চেষ্টা মন্দীভূত হয় নাই।

সংসারে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষার বীজ শৈশব হইতেই মধুসূদনের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল। সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, পরিণত বয়সে ইহাই তাঁহার অন্তরের একান্ত আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল এবং যতদিন তাহা হইতে পারেন

নাই, ততদিন তিনি নিরস্ত হন নাই। তাঁহার বাল্যের উচ্চাভিলাষ জননীর প্রদত্ত উৎসাহবাক্যে এবং পিতার আদর্শে সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। আন্তরিক উচ্চাভিলাষ ও বিদ্যানুরাগগুণেই মধুসূদন বঙ্গদেশের একজন গণ্যমান্য বিদ্বান হইতে পারিয়াছিলেন। পরিণত বয়সেও তাঁহার বিদ্যানুরাগ কিঞ্চিৎ মাত্র হ্রাস পায় নাই। মাদ্রাজে থাকিতে তিনি তেলেগু, তামিল, হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষায় এবং ফ্রান্সে অবস্থানকালে ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালীয় ভাষায় সফলতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ও লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ম, যেখান হইতেই সুবিধা পাইতেন, সেখান হইতেই পুস্তক আনাইয়া তিনি স্বীয় জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে রোগ, শোক, অর্থাভাবজনিত দুঃখ তাঁহার জীবনকে অত্যন্ত অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল। সেই দারুণ অশান্তির মধ্যেও তিনি জ্ঞানানুশীলন হইতে বিরত হন নাই।

মধুসূদনের জীবনের চরমোৎকর্ষ তাঁহার কাব্যানুরক্তি। নানাদেশীয় কাব্যশাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সমকক্ষ আর কোন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত বোধ হয় বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। মধুসূদনের জীবনের অনেক গুণের ন্যায় এই কাব্যানুরাগও তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার জননীর নিকট হইতে। সেই যুগেও জাহ্নবী দেবী লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। মধুসূদন আট-দশ বৎসর বয়সের সময় জননীকে এবং পাড়াপ্রতিবাসিনীদিগকে এই সমুদয় গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন

এবং তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে যখন চর্চ্চার অভাবে তিনি বঙ্গভাষা বিস্মৃত হইতেছিলেন, তখন কলিকাতা হইতে রামায়ণ ও মহাভারত আনাইয়া তাহা পাঠ করিতেন। কেবল রামায়ণ-মহাভারতই নহে, তিনি অন্যান্য বাংলা কাব্যগ্রন্থও যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতপাঠের সহিত মধুসূদনের ভবিষ্যৎ গৌরবময় জীবন অতি নিবিড়ভাবে জড়িত। বাল্যে পুনঃ পুনঃ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার কবিত্বশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন।

শৈশবে মধুসূদন যে পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন, সেই পাঠশালার গুরুমহাশয় অত্যন্ত কাব্যানুরাগী ছিলেন। বহু ফারসী কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ছাত্রদিগকে তিনি তাহা মুখস্থ করিতে উৎসাহ দিতেন। এই উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া মধুসূদন বহু ফারসী কবিতা কণ্ঠস্থ করেন। এই গুরুমহাশয়ের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা মধুসূদনের কাব্যজীবনস্ফুরণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

কাব্যানুরাগের ন্যায় মধুসূদনের হৃদয়ে সঙ্গীতপ্রিয়তাও ছিল অসাধারণ। গীতবাদ্য তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। আগমনী গান ও বিজয়া সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ভাবে তিনি এতই বিভোর হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার দুই নয়নে অশ্রুধারা বহিতে আরম্ভ করিত। পরিণত বয়সেও এই সঙ্গীতানুরাগ তাঁহার হৃদয়ে সমানভাবেই বর্ত্তমান ছিল।

মধুসূদনের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী ছিল অতুলনীয় প্রাকৃতিক

শোভায় পরিপূর্ণ। ইহার তিন দিকেই প্রসন্নসলিলা কপোতাক্ষী নদী নির্ম্মল জলের তরঙ্গ বিস্তার করিয়া অবিরাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপরাজিতে সাগরদাঁড়ী ছায়াচ্ছন্ন। সেই কুঞ্জবীথিকা অনবরত কোকিল, পাপিয়া, ঘুঘু, শালিক প্রভৃতি বিহঙ্গের মধুর কাকলীতে মুখরিত। তৃণাচ্ছাদিত ভূমি নদীর জল পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। নদী, প্রান্তর, বৃক্ষকুঞ্জ—যে সকল উপাদান লইয়া বিশ্বস্রষ্টা পল্লীপ্রকৃতি রচনা করিয়াছেন, সাগরদাঁড়ীতে তাহার কোনও অভাবই ছিল না। কপোতাক্ষীর পশ্চিমদিকে সুদূরপ্রসারিত শ্যামল প্রান্তর। নদীর উভয় তটে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষলতার অন্তরালে কৃষকদিগের কুটীর। শৈশব এই গ্রাম্য সৌন্দর্য্যে অতিবাহিত করিয়া মধুসূদনের হৃদয়ে কাব্যের অনুপ্রেরণা জন্মিয়াছিল। মধুসূদন পরিণত বয়সে যখন সুদূরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও তিনি সাগরদাঁড়ীর অনুপম সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। বহুকাল বিদেশে কাটাইয়া একবার সাগরদাঁড়ীতে আসিয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন : "কপোতাক্ষ! যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পারে সেও পরম সুখী।"

মধুসূদন যতদিন গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ততদিন তিনি কবিতা রচনা করিবার কোনও সুযোগ পান নাই। বাল্যকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল এবং তিনি গান করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি সময়ে সময়ে দুই-একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহা সঙ্গীদিগকে গাহিয়া শুনাইতেন। সময়ে সময়ে নিজে গল্প রচনা করিয়া সঙ্গীদিগকে শুনাইতেন।

কিন্তু তিনি কাহাকেও বলিতেন না যে, উহা তাঁহার নিজের রচনা।

মধুসূদন ' কখনও কোন কার্য্য করিতে গিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিতেন না। একবার তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র তাঁহাকে লইয়া খেজুররস চুরি করিতে যায়। মধুসূদন গিয়া গাছে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে গাছের মালিক আসিয়া তাড়া করে। পিতৃব্যপুত্রটি পলাইয়া যায়। কিন্তু মধুসূদন পলায়ন না করিয়া গাছের উপরে বসিয়াই কাঁদিতে থাকেন। তখন বাড়ীর চাকর আসিয়া তাঁহাকে গাছ হইতে নামাইয়া লইয়া যায়।

তিন

মধুসূদনের বয়স যখন ১২।১৩ বৎসর, তখন রাজনারায়ণ দত্ত তাঁহাকে শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় লইয়া আসেন। খিদিরপুরে কিছুদিন কোনও ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন।

ছাত্রদিগের ও শিক্ষকগণের গৌরবে হিন্দু কলেজ তখন বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বঙ্গদেশ আজ যাঁহাদের গৌরবে গৌরব বোধ করিয়া থাকে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই কলেজে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও বিশেষ কৃতবিদ্য ছিলেন।

হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া স্বীয় পরিশ্রম ও অধ্যয়নগুণে মধুসূদন একজন মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইলেন। প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সহাধ্যায়ীদিগকে অতিক্রম করিয়া উপরের শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মধুসূদন সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। তিনি ১৮৩৭ সালে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলেজ ত্যাগ করেন।

হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যবিষয় বর্ত্তমানের বি. এ.-শ্রেণীর পাঠ্যের প্রায় অনুরূপ ছিল। সুতরাং মধুসূদন ছয় বৎসরের মধ্যে ইংরেজী বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বি. এ.-শ্রেণীর পাঠ্যসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। মধুসূদন পঞ্চম শ্রেণী হইতে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া অনেক ছাত্রকে অতিক্রম করিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

গ্রামের পাঠশালায় পড়িবার সময় মধুসূদনের মধ্যে যে সমুদয় গুণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, হিন্দু কলেজে আসিয়া তথাকার শিক্ষাগুণে তাহা আরও বিশেষ রকমে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠশালায় যেমন কোনও ছাত্র কোনও বিষয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করে তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তেমনি হিন্দু কলেজেও যাহাতে তাঁহার সহাধ্যায়ীরা তাঁহাকে কোনও বিষয়ে অতিক্রম করিতে না পারে, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতন থাকিতেন। কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় তিনি ইংরেজী সাহিত্যের বহু পুস্তক পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রথমতঃ গণিতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, কিন্তু পরে যতই তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হইতে লাগিলেন, গণিতের প্রতি অনুরাগও তাঁহার ততই মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। গণিত কষিবার সময় তিনি হয় কোনও উপন্যাস বা কাব্য পড়িয়া কাটাইতেন, নতুবা শ্রেণীতে অনুপস্থিত থাকিতেন।

মধুসূদন হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরেজীলেখক ছাত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। মধুসূদন ও তাঁহার সহাধ্যায়িগণ একত্রে একখানি হস্তলিখিত সংবাদ-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাখানি তিন-চারি মাসের অধিককাল চলে নাই। মধুসূদন পরে শিক্ষক বাবু রামচন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন।

এইরূপে সপ্তদশ বৎসর বয়সেই পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় মধুসূদনের সংবাদপত্রে লেখা আরম্ভ হয়।

কলেজে অধ্যয়নের সময়েই পরদুঃখকাতরতা মধুসূদনের হৃদয়ে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। রাজপথের ক্রন্দনরত ভিক্ষুক ও দরিদ্র সহাধ্যায়ী ছাত্র—এই উভয়কেই মধুসূদন সমানভাবে সাহায্য করিতেন। পিতার অনুগ্রহে তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। পিতৃপ্রদত্ত অর্থে তিনি দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিয়া হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিতেন।

মধুসূদনের চরিত্রে আত্মসংযমের বড়ই অভাব ছিল। এই অসংযমের বিষ মধুসূদনের হৃদয়ে সংক্রমিত হয় যখন তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পিতা ওকালতি করিয়া অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং তাঁহার অর্থের কোনও অভাব হইত না। ইহার উপর আবার মধুসূদন জননীর নিকট হইতেও প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ পাইতেন। এই অর্থে মধুসূদন লক্ষপতির সন্তানের ন্যায় চূড়ান্তভাবে বিলাসিতা করিতেন। নিত্য মূল্যবান পোশাকপরিচ্ছদ ও গন্ধদ্রব্য না হইলে তাঁহার চলিত না। হিন্দু কলেজে যাঁহারা পড়িতেন, তাঁহারা সকলেই ধনীর সন্তান, কাজেই তাঁহারা সকলেই বিলাসী ছিলেন। কিন্তু বিলাসিতায় মধুসূদন তাঁহাদের সকলকে ছাড়াইয়া উঠিতেন। এই বিলাসিতা অপেক্ষাও আরও গুরুতর দোষ মধুসূদনের চরিত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। এই সকল দোষই পরিণামে তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। মধুসূদন পরিণত বয়সেও আর এই সমুদয় দোষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

চার

হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক কাপ্তেন ডি. এল্. রিচার্ডসন ছাত্রদিগকে সাহিত্য ও কাব্যরচনায় উৎসাহ দিতেন। তিনিও একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা ও উৎসাহই মধুসূদনের কবিত্বশক্তিবিকাশের প্রধান সহায় হইয়াছিল। রিচার্ডসনের দৃষ্টান্তে তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয় ইংরেজী গদ্য ও পদ্য-রচনায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত। রিচার্ডসন ছাত্রদিগের রচনা যত্নপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট রচনাগুলি কোনও সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দিতেন। রিচার্ডসনের ন্যায় সুলেখক হইব—এই উচ্চাভিলাষ তখনকার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই হৃদয়ে পোষণ করিতেন। রিচার্ডসনও ছাত্রদিগের এই আশা যাহাতে ফলবতী হয়, সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না।

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া যে কবিত্বের বীজ শৈশবেই মধুসূদনের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, রিচার্ডসনের উৎসাহ ও শিক্ষার প্রভাবে তাহার পরিণত মহীরুহে পরিণত হইবার সুযোগ ঘটে।

কলেজের অতি নিম্ন শ্রেণী হইতেই মধুসূদন ইংরেজীতে গদ্য ও পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। পঠদ্দশায় ইংরেজ কবি বায়রণই তাঁহার আদর্শ ছিলেন, কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার আদর্শ হয় কবি মিল্টন। তাঁহার রচনা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ না

হইলেও একজন অষ্টাদশবর্ষীয় বাঙ্গালী কিশোরের পক্ষে সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাষায় গদ্য ও পদ্য রচনা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। মধুসূদন কবিতারচনার ক্ষমতা ভগবৎকৃপাবলেই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখনই যে ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, তখনই সেই ভাষায় অবলীলাক্রমে কবিতা রচনা করিয়াছেন।

বন্ধুবান্ধবদিগকে মধুসূদন যে পত্র লিখিতেন, তাহা ইংরেজী পদ্যেই লিখিত হইত। বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট কোন জিনিস চাহিবার সময়ও তিনি অনেক সময় কবিতাই ব্যবহার করিতেন।

শৈশবে জননীর নিকট থাকিবার সময় যদিও মধুসূদন রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি সানন্দে ও সাগ্রহে পাঠ করিতেন, কিন্তু হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি বাংলা ভাষার চর্চ্চা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, বাংলা ভাষাকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন বাংলা ভাষা অশিক্ষিত ও বর্ব্বরের ভাষা এবং তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল,—ইহাই ছিল মধুসূদনের সাধারণ সংস্কার।

মধুসূদন যখন সিনিয়র বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন রামগোপাল ঘোষ স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক রচনার জন্য দুইটি পদকপুরস্কার ঘোষণা করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় হইবেন, তাঁহারাই এই পুরস্কার পাইবেন। প্রথম পুরস্কারের জন্য স্বর্ণপদক এবং দ্বিতীয় পুরস্কারের জন্য রৌপ্যপদক নির্দ্দিষ্ট হয়। এই রচনাপ্রতিযোগিতায় মধুসূদন প্রথম এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় স্থান

অধিকার করিয়া যথাক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পুরস্কার লাভ করেন।

রিচার্ডসনের যত্নে মধুসূদনের লিখিত বহু কবিতা তখনকার কোনও কোনও সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জন্য ছাত্রাবস্থা হইতেই মধুসূদন একজন ভাবী সুকবি বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। মধুসূদন যে ভাবী জীবনে একজন বড় কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবেন, এই ধারণা তাঁহার সহপাঠিগণের অনেকেই হৃদয়ে পোষণ করিতেন এবং এই বিষয়ে মধুসূদনেরও অন্তরে গভীর বিশ্বাস ছিল।

ইংলণ্ড সেক্সপীয়র, মিল্টন, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবিশিরোমণিদিগের জন্মভূমি, তাই হিন্দু কলেজে পড়িবার সময়ই মধুসূদনের বিলাত গমনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাঁহার হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডে যাইতে না পারিলে তিনি বড় কবি হইতে পারিবেন না।

পাঁচ

এইবার মধুসূদনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের কথা।

মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? এই কথার অভ্রান্ত উত্তর দেওয়া কঠিন। কেহ কেহ বলেন, মধুসূদনের হিন্দু কলেজে অধ্যয়নই খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণের কারণ। কিন্তু তাহা সত্য নহে। হিন্দু কলেজের শিক্ষক রিচার্ডসন এবং ডেভিড হেয়ার খৃষ্টান হইলেও ছাত্রগণ যে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাঁহারা তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এতদ্দেশীয় লোকদিগের কোন অনুরাগসৃষ্টি হয় নাই। ধর্ম্মলোপ পাইবার ভয়ে তখনকার কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেকে ইংরেজী পড়িতেই দেওয়া হইত না। ইহার উপর হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আর কেহই হিন্দু কলেজে ছাত্র প্রেরণ করিতে সম্মত হইবে না। তাহা হইলে বিদ্যালয়টি একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই জন্য হিন্দু কলেজের প্রাণস্বরূপ ডেভিড হেয়ার খুব সতর্ক ছিলেন। ছাত্রগণ যাহাতে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের সংস্পর্শে না আসিতে পারে, সেই জন্য তিনি বিশেষ সাবধান ছিলেন। বিশেষতঃ খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। এরূপ অবস্থায় হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন যে মধুসূদনের খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের কারণ, তাহা সত্য নহে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াই যে মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কথাও ঠিক নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংলণ্ড-

গমন মধুসূদনের অন্তরের একান্ত অভিলাষ ছিল। সেই অভিলাষ চরিতার্থ করিতেই তাঁহার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহার জনকজননী তাঁহার বিবাহ দিতে একটি পাত্রী স্থির করেন। কিন্তু সেই বিবাহ করিলে তাঁহার বিলাত-গমনে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মধুসূদন বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। মধুসূদন তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্রের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ "আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না। আমি এমন কাজ করিব যে, সেজন্য বাবাকে চিরকাল দুঃখ পাইতে হইবে।"

মধুসূদনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের আর একটি কারণও ছিল। তিনি এক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী বালিকার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মধুসূদন মনে করিলেন, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এই বালিকাকে তিনি বিবাহ করিতে পারিবেন, মাতাপিতার মনোনীতা পাত্রীকে আর বিবাহ করিতে হইবে না, অধিকন্তু তিনি অনায়াসে তখন বিলাত যাইতে পারিবেন। তখন বিলাত গমন করিলে সমাজচ্যুত হইতে হইত। মধুসূদন মনে করিলেন, একদিন না একদিন তিনি বিলাত যাইবেনই এবং তাঁহাকে সেইজন্য একদিন সমাজচ্যুত হইতেই হইবে, তবে পূর্ব্বেই মনোনীতা পাত্রীকে বিবাহ করিয়া সমাজচ্যুত হইলে দোষ কি?

মনে মনে এইরূপ ধারণা করিয়া মধুসূদন সহসা একদিন পিতৃগৃহ হইতে অদৃশ্য হইলেন। মধুসূদন যে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, আত্মীয়স্বজনেরা পূর্ব্বে কখনও তাহা ধারণা করিতে

পারেন নাই। মধুসূদনের সহসা গৃহ হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন।

খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণেচ্ছু বালকেরা পাছে আত্মীয়স্বজনদিগের অনুরোধে তাহা হইতে বিরত হয়, এইজন্য খৃষ্টধর্ম্মযাজকেরা সেই বালকদিগকে আত্মীয়স্বজনদিগের নিকট হইতে সরাইয়া তাহাদের নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিত। মধুসূদন সম্বন্ধে তাহারা আরও কঠোরতা অবলম্বন করিল। তাহারা জানিত যে, মধুসূদনের পিতা একজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী লোক, কলিকাতায় তাঁহাদের প্রভাবশালী আত্মীয়স্বজনেরও অভাব নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বলপ্রয়োগে তাহাদের নিকট হইতে মধুসূদনকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারেন। এই ভয়ে খৃষ্টধর্ম্মযাজকেরা মধুসূদনকে একেবারে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে লইয়া যাইয়া তথায় আবদ্ধ করিয়া রাখিল। মধুসূদনের পিতা লোকজন লইয়া পুত্রকে উদ্ধার করিবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

মধুসূদন কয়েকদিন দুর্গে থাকিয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার মধুসূদন নামের সহিত 'মাইকেল' এই খৃষ্টান নাম সংযুক্ত হইল।

মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেও মাতাপিতা তাঁহাকে পূর্ব্বের মতই স্নেহ করিতেন। মধুসূদনের জননী যেদিন শুনিলেন যে, পুত্র খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তিনি পাগলিনীর মত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া রাজনারায়ণ দত্ত মধুসূদনকে প্রায়ই গোপনে

গৃহে ডাকিয়া আনিতেন কিন্তু সমাজের ভয়ে তাঁহাকে গৃহে রাখিতে সাহসী হইতেন না। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও মধুসূদন যাহাতে ভবিষ্যতে সুশিক্ষিত হইয়া কীর্ত্তিমান হইতে পারেন, সেজন্য মাতাপিতা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় অর্থসাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

দেশীয় খৃষ্টান ও ইংরেজ বালকদিগের শিক্ষার জন্য সে সময়ে শিবপুরে বিশপস কলেজ নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। মধুসূদন সেই বিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা করিলে রাজনারায়ণ দত্ত সানন্দে সেই ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন।

হিন্দু কলেজ যেমন মধুসূদনের রচনাশিক্ষার স্থান, তদ্রূপ বিশপস কলেজ ছিল তাঁহার ভাষাশিক্ষার স্থান। মধুসূদন ছিলেন একজন বহুভাষাবিদ ব্যক্তি। ইংরেজী ভাষা তাঁহার মাতৃভাষার ন্যায় ছিল। এতদ্ব্যতীত লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালীয় ভাষায়ও তিনি অনায়াসে কথোপকথন করিতে এবং পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। ফরাসী এবং ইতালীয় ভাষায় তাঁহার এতদূর অধিকার ছিল যে, তিনি ঐ দুই ভাষায় কবিতা পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন। এই ছয়টি ইউরোপীয় ভাষা ব্যতীত সংস্কৃত, ফারসী, হিব্রু, তেলেগু, তামিল এবং হিন্দী—এই কয়টি ভাষাতেও তাঁহার অল্পাধিক অধিকার ছিল। ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত এইরূপ একান্ত অনুরাগ খুব অল্প লোকের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিশপস কলেজ হইতেই ভাষা-শিক্ষায় তাঁহার এই অনুরাগ আরম্ভ হয়। এই কলেজে প্রবেশ

করিয়া তিনি গ্রীক, লাটিন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

মধুসূদন বিশপস কলেজে চারিবৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভাষাশিক্ষা ও কবিতারচনা সম্বন্ধে এই কয়েক বৎসরে তিনি অভাবনীয় উন্নতি করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি সদাচার ও সংযম সম্বন্ধে কোনও উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। এখানে তাঁহার কোনও শাসক কিংবা অভিভাবক ছিল না, তিনি নিজেই ছিলেন তাঁহার অভিভাবক। মাতাপিতা তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। কিন্তু কিভাবে যে তিনি সেই অর্থ ব্যয় করিতেন, তাঁহারা তাহার কোনও সংবাদ রাখিতেন না।

খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে মধুসূদনের হৃদয়ের শান্তি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে থাকে। তিনি সময় সময় জননীর অনুরোধে পিতৃগৃহে আগমন করিতেন বটে, কিন্তু গৃহও তাঁহার পক্ষে শান্তিস্থল ছিল না। ধর্ম্মমত এবং আচারব্যবহার লইয়া পিতার সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার বাদানুবাদ চলিত। পিতা তিরস্কার করিতেন, কিন্তু মধুসূদনের তাহা সহ্য হইত না। তিনি উদ্ধত-ভাবে পিতার কথার উত্তর প্রদান করিতেন। পুত্রের এই ব্যবহারে পিতা অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মধুসূদনের মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন।

মধুসূদনের প্রাণের শান্তি ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। যে সকল আশার মোহে অন্ধ হইয়া তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাহার কিছুই তাঁহার লাভ হইল না। মধুসূদনকে পূর্ব্বে যাহারা ভালবাসিত, খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণের পর তাহারা ক্রমশঃ তাঁহার

নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। মধুসূদনের মনে এই ধারণা জন্মিল যে, এই বিশ্বসংসারে তাঁহাকে স্নেহ করিবার বা ভালবাসিবার কেহই নাই। কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতে পারিলে হয়ত তাঁহার হৃদয়ে শান্তি আসিতে পারে, মধুসূদনের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে এই ধারণা জন্মিতে লাগিল।

বিশপস কলেজে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কয়েকজন ছাত্র পড়িত। তাহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাহাদের নিকট মাদ্রাজের কথা শুনিয়া মধুসূদনের মনে হইতে লাগিল, মাদ্রাজে যাইতে পারিলে হয়ত তিনি শান্তি পাইতে পারেন। গোপনে সমস্ত পরামর্শ স্থির হইল। অবশেষে একদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে চলিয়া গেলেন।

ছয়

মাদ্রাজে পৌঁছিয়া মধুসূদন দারুণ অর্থকষ্টে পতিত হইলেন। এতদিন মাতাপিতার অর্থানুকূল্যে দারিদ্র্য যে কি বস্তু, তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এইবার দারিদ্র্যের তিক্ত স্বাদ তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া তিনি যে সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মাদ্রাজ গমন ও তথায় কিয়দ্দিন অবস্থানের পরই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। এই নিঃসম্বল অবস্থায় মাদ্রাজে পৌঁছিবার কিছুদিন পরেই তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

মাদ্রাজে মধুসূদনের পরিচিত একজন লোকও ছিল না। মাদ্রাজ তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। কাহারও নিকট যে এক পয়সা সাহায্য পাইবেন, সে আশাও নাই। এইরূপ অবস্থায় মাদ্রাজে আসিয়া তিনি বড়ই বিপদে পড়িলেন। নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে অবশেষে মাদ্রাজের দেশীয় খৃষ্টান ও ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের শরণাপন্ন হইতে হইল। তাহাদের চেষ্টায় মধুসূদন তথাকার মাতাপিতৃহীন ফিরিঙ্গী বালকবালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য পাইলেন। তাঁহার অর্থাভাব কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইল।

মধুসূদন এইবার উপায়ান্তরের অভাবে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সাহিত্যের সেবা করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি মাদ্রাজের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

এদেশীয়দিগের মধ্যে খুব কম লোকই মধুসূদনের ন্যায় ইংরেজী লিখিতে পারিত। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই লেখক হিসাবে তাঁহার সুনাম চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

মাদ্রাজের একখানি পত্রিকার জন্য তিনি পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার বিবরণ অবলম্বন করিয়া একখানি উপাখ্যান ইংরেজীতে লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে সাধারণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উহা তিনি 'ক্যাপ্টিভ লেডী' নামে প্রকাশিত করেন। ইহাই মধুসূদনের রচিত প্রথম গ্রন্থ। 'ক্যাপ্টিভ লেডী' পাঠ করিলে মধুসূদনের রচনার আদর্শ অনেকটা অনুমান করা যায়। যে অলঙ্কারবিন্যাস মধুসূদনের রচনার একটি বিশিষ্ট গুণ, 'ক্যাপ্টিভ লেডী'তে তাহার বিশেষত্ব লক্ষিত হয়।

মধুসূদন মাদ্রাজে বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। 'ক্যাপ্টিভ লেডী' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি রেবেকা ম্যাক্টাভিস্ নাম্নী এক স্কচ বংশোদ্ভবা কুমারীর পাণি-গ্রহণ করেন। কিন্তু মধুসূদন তখনও সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ ও আত্মসংযম শিক্ষা করেন নাই। এই জন্য বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই এই পত্নীর সহিত মধুসূদনের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল।

অতঃপর মধুসূদন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের জনৈক অধ্যাপকের কন্যা কুমারী হেনরিয়েটাকে বিবাহ করেন।

'ক্যাপ্টিভ লেডী' রচনা করিয়া মধুসূদন মাদ্রাজের কৃত-বিদ্য সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের প্রায় সমুদয় বিখ্যাত পত্রিকাতেই পুস্তকখানির যথেষ্ট প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রশংসায় মধুসূদন পরিতৃপ্ত হইতে পারেন

নাই। তাঁহার প্রয়োজন ছিল অর্থের, কিন্তু তিনি 'ক্যাপ্টিভ লেডী' হইতে আশানুরূপ অর্থলাভ করিতে পারেন নাই। মুদ্রাযন্ত্রের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে না পারিয়া তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধুসূদন মনে করিয়াছিলেন, কলিকাতার বিদ্বজ্জনসভায় হয়ত 'ক্যাপ্টিভ লেডী'র সমাদর হইবে। এই জন্য কতকসংখ্যক পুস্তক তিনি কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু কলিকাতায় ঐ পুস্তকের মোটেই আদর হয় নাই। কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিও 'ক্যাপ্টিভ লেডী' সম্বন্ধে কোনও প্রশংসাজনক সমালোচনা প্রকাশ করে নাই। এমন কি, কেহ কেহ তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যেন খ্যাতিলাভের দুরাশা হৃদয়ে পোষণ না করেন। মধুসূদন ইহাতে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলেন। তাঁহার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি হইবেন। নানাভাবে ব্যথিত হইয়াও তিনি সেই আশা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অন্য পথ অবলম্বন করিয়া স্বীয় লক্ষ্যস্থানে উপনীত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। নিন্দা, উপেক্ষা, দারিদ্র্য, পারিবারিক অশান্তি—কিছুই তাঁহাকে এই বিষয় হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

'ক্যাপ্টিভ লেডী' প্রকাশিত হওয়ার পর মধুসূদন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন যে, বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাঁহার কলিকাতার বন্ধুদিগের মধ্যেও অনেকেই তাঁহাকে এইভাবে উপদেশ দিতেছিলেন। ইংরেজদিগের মধ্যে সুপরিচিতনামা

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মধুসূদনকে তাঁহার মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

মাদ্রাজে একাদিক্রমে আটবৎসর অতিবাহিত করায় মধুসূদন বাংলাভাষা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তখন মাদ্রাজে এমন কেহ ছিল না, যাহার সহিত তিনি বাংলায় একটা কথা বলিতে পারেন। শুভক্ষণে মধুসূদন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার দৃষ্টি অনাদৃতা মাতৃভাষার উপর পড়িল। তাঁহার এই ধারণা জন্মিল যে, বাংলাভাষাই তাঁহার কবিত্বশক্তিবিকাশের প্রকৃত ক্ষেত্র এবং সেই ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই সময় হইতে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

বাংলাভাষায় জ্ঞানলাভের জন্য তিনি কলিকাতা হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাশী মহাভারত আনাইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

মধুসূদনের মাদ্রাজ গমনের তিনবৎসর পরে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। মৃত্যুসময়ে তাঁহার সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎ হয় নাই। জননীর মৃত্যুর চারিবৎসর পরে মধুসূদনের পিতাও পরলোকগমন করেন। মধুসূদন পিতার মৃত্যুসংবাদ পান নাই। তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ কেহ তাঁহার সংবাদ রাখিতেন না, তিনিও কাহারও সংবাদ লইতেন না। মধুসূদনের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মধুসূদনের বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক মহাশয় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট পত্রাদি লিখিতেন। মধুসূদনের পিতার মৃত্যুর পর তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মধুসূদনের পিতার সম্পত্তি অন্যে অধিকার করিয়া লইতেছে, তখন তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়া পিতৃসম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য মধুসূদনকে পত্র লিখিলেন।

গৌরদাসবাবুর এই আহ্বান মধুসূদনের নিকট বড়ই সময়োচিত বলিয়া বিবেচিত হইল। তিনি মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মধুসূদন মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সাত

আটবৎসর পরে মধুসূদন বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তখন আর বাংলাদেশ তাঁহার স্বদেশের মত ছিল না। কারণ, তখন তাঁহার জনকজননী পরলোকগত। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকে মধুসূদনকে চিনিতে পারিলেন না, যাঁহারা পারিলেন তাঁহারাও ধর্ম্মান্তরিত মধুসূদনের প্রতি সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করিলেন। বাল্যসুহৃদ-গণের মধ্যে অনেকে তখন আর এই পৃথিবীতে ছিলেন না ; যাঁহারা বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই-একজন ব্যতীত কেহই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা দেখাইলেন না। কাজেই মধুসূদনের স্বদেশ তাঁহার নিকট বিদেশের মতই মনে হইতে লাগিল।

মধুসূদনের নিজের মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। ইংরেজ মহিলা বিবাহ করিয়া এবং বহুদিন বিধর্ম্মীয় ও বিজাতীয় সমাজের মধ্যে বাস করিয়া পোশাকপরিচ্ছদে, আহারবিহারে এবং আচারব্যবহারে তাঁহার মধ্যে বাঙালীত্ব বলিতে কিছুই ছিল না। তাঁহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলকায় হইয়াছিল, কণ্ঠস্বরেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি বাংলাভাষা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের সহিত তিনি ইংরেজীতেই কথাবার্ত্তা বলিতেন, সময়ে সময়ে কথোপকথনে যে দুই-একটি বাংলা শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহাও সম্পূর্ণ বিজাতীয় ও বিকৃতসুরে। হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় তিনি যে বলিতেন,

বাংলা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল, মাদ্রাজে প্রবাসের ফলে তাঁহার জীবনে সে কথা সত্য হইয়াছিল!

এই সময়ে বাংলা সাহিত্যেও একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সম্মিলনে বাংলা সাহিত্য রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিতার ক্ষেত্রে একটা নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গদ্যসাহিত্যে একটা অভিনব যুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তাঁহাদের পূর্ব্বে আর বাংলা গদ্যসাহিত্য এইরূপ অভিনব ধারায় রচিত হয় নাই। প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাবান লেখকের হস্তে এইবার বাংলা ভাষা নূতন শক্তিলাভ করিয়া নূতনভাবে সম্প্রসারিত হইতেছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের দৃষ্টিও ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল।

বাংলা সাহিত্যের এই যুগসন্ধিক্ষণে মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তিনি একেবারে নিঃসম্বল। বন্ধুবান্ধবদিগের চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতায় পুলিশ আদালতে একটি কেরানীগিরির কার্য্য পাইলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার্য্যে তাঁহার উন্নতি হইল। সাধারণের অজ্ঞাত ও অপরিচিতভাবে মধুসূদনের দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাকে বেশিদিন এইভাবে থাকিতে হয় নাই।

বাংলাদেশে তখন অতি অল্পদিন মাত্র নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গালীর নাট্যশালারও উন্মেষ হইয়াছে ইংরেজ রাজত্বে। ইংরেজেরা প্রথমে এদেশে নাট্যশালা স্থাপন করিয়াছিল। সেই সকল

নাট্যশালায় যাতায়াত করিতে করিতে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়েও নাট্যশালাস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাহার ফলে কলিকাতার কোন কোন ধনীর গৃহে নাট্যশালা স্থাপিত হইয়া তথায় বাংলা ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইতে থাকে। এইরূপ অভিনয়ের উদ্যোক্তাদিগের মধ্যে পাইকপাড়ার সিংহপরিবারস্থ রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা এই সময়ে আপনাদিগের বেলগাছিয়াস্থ উদ্যানে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ের জন্য বিপুলভাবে আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত কলিকাতার বহু ইংরেজ, ইহুদী, পার্শী প্রভৃতির পরিচয় ছিল। স্থির হইল, তাঁহাদিগকেও অভিনয়দর্শনে আমন্ত্রণ করা হইবে। কিন্তু তাঁহারা বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া বাংলা নাটকের অভিনয়ের মর্ম্ম কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এই জন্য স্থির হয় যে, 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। মধুসূদন যে ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে একজন প্রগাঢ় সুপণ্ডিত ব্যক্তি, তাহা পূর্ব্বেই শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। মাইকেলের বন্ধু বাবু গৌরদাস বসাকের অনুরোধে মধুসূদনের উপরেই সেই অনুবাদের ভার অর্পিত হয়। সেই হইতে রাজাদিগের উভয় ভ্রাতার সহিত এবং মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হয়।

মধুসূদনের কৃত অনুবাদ সকলেরই মনঃপূত হইল। ইহার

জন্য তাঁহার পারিশ্রমিক বাবদ তাঁহাকে পাঁচশত টাকা দেওয়া হইল।

১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অভিনয় হইল। পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবারও অভিনয় হইয়াছিল। এই অভিনয় এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল এবং দর্শকগণ সেই অভিনয় দর্শনে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এইরূপ অভিনয় তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দর্শন করেন নাই।

'রত্নাবলী' অভিনয়ের প্রশংসা সমস্ত বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংবাদপত্রসমূহে তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ঘোষিত হইল। সেই সঙ্গে 'রত্নাবলী' অনুবাদক মাইকেল মধুসূদনের নামও চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এই হইতেই মধুসূদনের ভবিষ্যতের উন্নতিপথের সূচনা হইল। তাঁহাকে আর পথভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয় নাই। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় মধুসূদন তাঁহার ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জ্বল পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

আট

'রত্নাবলী' নাটকের রিহার্সেল দেখিবার সময় একদিন মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে বলিলেন: "দেখ, রত্নাবলীর মত একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের অভিনয়েয় জন্য রাজারা এইরূপ অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।"

গৌরদাসবাবু বলিলেন: " 'রত্নাবলী' যে একখানা অতি সামান্য নাটক, তাহা জানি। কিন্তু ভাল নাটকই বা কোথায়? ভাল নাটক পাইলে কি আর 'রত্নাবলী'র অভিনয় হইত?"

মধুসূদন বলিলেন: "আচ্ছা, একখানা ভাল নাটক আমি রচনা করিয়া দিব।"

মধুসূদনের কথা শুনিয়া গৌরদাসবাবু মনে মনে হাসিলেন। তিনি মনে করিলেন, যে ব্যক্তি বাংলা ভাষায় ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না, বাংলায় একখানা চিঠি লিখিতে হইলে যাহার গলদ্ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়, যে 'পৃথিবী' বানান লিখিতে লেখে 'প্রথিবী', সেই ব্যক্তি রচনা করিবে ভাল বাংলা নাটক!

তিনি মনের ভাব গোপন রাখিয়া মধুসূদনকে বলিলেন: "বেশ ত, লেখ না।"

মধুসূদনের হৃদয় তখন উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি তাহার পরদিনই এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে সে সময়কার প্রচলিত কতকগুলি বাংলা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক আনাইয়া তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরেই তিনি 'শর্ম্মিষ্ঠা' নামক একখানা নাটক লিখিতে আরম্ভ

করিলেন। কিয়দংশ লিখিয়া যখন তিনি উহার পাণ্ডুলিপি আনিয়া গৌরদাসবাবুকে দেখাইলেন, গৌরদাসবাবু তাহা পাঠ করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। মধুসূদনের রচনা সত্য সত্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গৌরদাসবাবুর মুখে নাটকরচনার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। সেই অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাঁহারা এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, সেই অসমাপ্ত পুস্তক সমাপ্ত করিবার জন্য তাঁহারা মধুসূদনকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া মধুসূদন নাটকখানি সমাপ্ত করিয়া লইয়া আসিলেন।

'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের দোষগুণ সম্পর্কে নবীন ও প্রাচীনপন্থীরা দুইদলে বিভক্ত হইলেন। একদল নাটকখানির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আর একদল উহা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী লিখিত হয় নাই বলিয়া নিন্দাও করিতে লাগিলেন। মধুসূদনের রচিত নাটকের ভাষা সুমধুর, চরিত্রচিত্রণ অপূর্ব্ব, ঘটনাসমাবেশও অনন্যসাধারণ ; ইহা দেখিয়া নব্য সম্প্রদায়ের অনেকই বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র 'শর্ম্মিষ্ঠার' পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহারা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় সেই নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। তাঁহারা এই গ্রন্থরচনার জন্য মধুসূদনকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া তাঁহাদের নিজ ব্যয়ে গ্রন্থখানি মুদ্রিত করাইলেন। ১৮৫৮ সালের প্রথমেই 'শর্ম্মিষ্ঠা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও এই নাটকখানির ইংরেজী অনুবাদ ছাপা হইয়াছিল। মধুসূদন নিজেই নাটকখানি অনুবাদ করিয়াছিলেন।

'শর্ম্মিষ্ঠা'র অভিনয়দর্শনে দর্শকেরা এবারও পরম পরিতৃপ্ত ও মুগ্ধ হইল। অভিনয়ের প্রশংসার সহিত অভিনীত নাটকের প্রশংসাও সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল।

'শর্ম্মিষ্ঠা'রচনার পর মধুসূদন বাংলাভাষারও একজন সুলেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। পাইকপাড়ার রাজাদিগের সমাদরে মধুসূদন সাধারণেরও সমাদরভাজন হইলেন। রাজাদিগের কৃপা এবং উদারতায় মধুসূদন ঋণভার হইতে মুক্ত হইলেন। এইবার মধুসূদনের হৃদয় শান্ত হইল। এইবার তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইংরাজীতে গ্রন্থরচনা অপেক্ষা বাংলায় গ্রন্থ রচনা করিয়াই তিনি যশস্বী হইতে পারিবেন। কালবিলম্ব না করিয়া মধুসূদন আর একখানি নাটকরচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

এই নাটকখানির নাম 'পদ্মাবতী'। ইহা গ্রীক পুরাণের ছায়া-অবলম্বনে রচিত হইল। গ্রীক পুরাণের সুপরিচিত স্বর্ণময় আপেলের উপাখ্যানের আদর্শে বিদর্ভরাজ নীলধ্বজের সহিত মাহিষ্মতীপুরের রাজকন্যা পদ্মাবতীর মিলন এই নাটকের বিষয়-বস্তু। কিন্তু মধুসূদন এই নাটকরচনায় সর্ব্বত্রই গ্রীক পুরাণ অনুসরণ করেন নাই। এই নাটকে তিনি গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহার করিলেন। পদ্যগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এই

অমিত্রাক্ষর ছন্দ-রচনা মধুসূদনের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব, এই জন্যই তিনি বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

নাটকরচনা হইতেই মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা হইত। মধুসূদন যখন 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করিতেছিলেন, তখন যতীন্দ্রমোহনের সহিত তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা হইত। মধুসূদন মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে বলিলেন: "যতদিন বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন না হইবে, ততদিন বাংলা নাটকের বিশেষ কোনও উন্নতির আশা নাই।"

উত্তরে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন বলিলেন: "বাংলা ভাষার যে অবস্থা, তাহা বিবেচনা করিলে কোনও দিন যে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন হইবে, তাহার আশা নাই।"

মধুসূদন বলিলেন: "আমি তাহা মনে করি না। চেষ্টা করিলে আমাদের সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন হইতে পারে।"

কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর মধুসূদন বলিলেন: "আমাদিগের ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কিনা, আমি তাহা আপনাকে দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আমি যদি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনাকে দেখাই, তবে আপনি কি করিবেন?"

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন: "আমি তাহা হইলে পরাজয় স্বীকার করিব এবং আপনার রচিত গ্রন্থ আমি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দিব।"

মধুসূদন যে তাঁহার 'পদ্মাবতী' নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, উক্ত আলোচনাই তাহার কারণ। আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দেই একখানি নাটক রচনা করিবার বাসনা মধুসূদনের ছিল। কিন্তু তাহা হইলে নাটকখানি সাধারণের নিকট আদরণীয় না-ও হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকের অংশবিশেষ মাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের সহিত এই আলোচনার পর হইতেই মধুসূদন বাংলা কবিতার আলোচনায় মনেযোগী হইলেন। তিনি অনেকদিন পরে আবার তাঁহার বাল্যের আদরের কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিনের মধ্যেই মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ রচনা করিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখাইলেন। যতীন্দ্রমোহন ইহাতে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রমোহন মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থসংগ্রহ' তখন একটি বিশেষ বিখ্যাত পত্রিকা ছিল। অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই আদরের সহিত তাহা পাঠ করিতেন। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। তাহা পাঠ করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই পরম আনন্দ লাভ করিলেন। মধুসূদনেরও আনন্দের সীমা রহিল না।

কাব্যের অবশিষ্টাংশ লেখা সম্পূর্ণ হইলে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন নিজ ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত করিয়া দিয়া তাঁহার পূর্ব্ব

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। ১৮৬০ সালের মে মাসে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে একদল ইহার ভূয়সী প্রশংসা এবং একদল লোক ইহার ঘোরতর নিন্দা করিয়াছিলেন। যাঁহারা নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, মধুসূদন এই ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের কি উন্নতি করিয়া গেলেন। মধুসূদন নিজে ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন এই কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন। মধুসূদন এই কাব্যখানি মহারাজের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ

"যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোনও কথাই বলা বাহুল্য। কেন না, এরূপ পরীক্ষাবৃক্ষের ফল সদ্য পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন এদেশের সর্ব্বসাধারণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়ত, সেই শুভকালে এ কাব্যরচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতম মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবে যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না।"

মধুসূদনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্য হইতে বাস্তবিকই বাংলা সাহিত্যের এক নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য পৌরাণিক সুন্দ-উপসুন্দের উপাখ্যান

লইয়া রচিত। কিন্তু মধুসূদন সর্ব্বাংশে মূল উপাখ্যান অনুসরণ করেন নাই। স্থানে স্থানে তিনি তাঁহার মৌলিক কল্পনা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক কাব্যের ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই কাব্য প্রকাশিত হইবার পর মধুসূদনের উপর যেমন প্রশংসার পুষ্প অজস্রধারায় বর্ষিত হইয়াছিল, তদ্রূপ নিন্দা, গ্লানি ও উপহাসের তীব্র কষাঘাতও নিতান্ত অল্প পরিমাণে তাঁহার উপর বর্ষিত হয় নাই। কিন্তু মধুসূদন বীরোচিত সহিষ্ণুতাগুণে তাহা নীরবে সহ্য করিয়া গিয়াছেন। চিরাভ্যস্ত দৃঢ়তার সহিত বিরুদ্ধবাদিগণের কথা উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বীয় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের পরেই তিনি দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে প্রথমখানির নাম 'একেই কি বলে সভ্যতা', দ্বিতীয়খানির নাম 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এই দুইখানিই প্রহসন। দুইখানিই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ কোনখানিই অভিনীত হয় নাই।

তখন পাশ্চাত্ত্য সমাজের দৃষ্টান্ত ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে কলিকাতায় সমাজের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। শিক্ষিত নামধারী ব্যক্তিরা দলবদ্ধ হইয়া মদ্যপান, হিন্দুশাস্ত্র-নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ এবং স্বদেশীয় প্রতিটি আচার-ব্যবহারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন ; ইহাই তাঁহাদিগের নিকট সভ্যতার ও সমাজসংস্কারের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

লোকে ইঁহাদিগকে 'ইয়ং বেঙ্গল' বলিত। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এই শ্রেণীকেই লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল।

বকধর্ম্মী প্রাচীনপন্থী দলের ভণ্ডামিপূর্ণ আচরণে তখন হিন্দু-সমাজের বহুবিধ অকল্যাণ সাধিত হইতেছিল। তাঁহারা বাহিরে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহাদের চরিত্র ও ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্রসমূহকে উপহাস করিত। এই শ্রেণীর লোকদিগকে ব্যঙ্গ করিয়াই মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' রচিত হইয়াছিল।

মধুসূদন তখন কেবলমাত্র তিন বৎসর যাবৎ বাংলা সাহিত্যের সেবা আরম্ভ করিয়াছেন। এই কয় বৎসরে তাঁহার 'শর্ম্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী' ও 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য—এই পাঁচ-খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। নব্যসম্প্রদায় তাঁহার গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইলেন, তাঁহার নিন্দুকের দল তাঁহাকে উপহাস করিলেও তিনি যে একজন অসাধাণ প্রতিভাশালী কবি, তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগে মধুসূদন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন।

নয়

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য প্রকাশিত হওয়ার পরই মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' কাব্যরচনা আরম্ভ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথমাংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়াংশ পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এবং 'মেঘনাদবধ' কাব্য মধুসূদন প্রায় এক সময়েই আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রায় এক সঙ্গেই তিনখানি গ্রন্থ শেষ হইয়াছিল। এই সময়ে মধুসূদনের প্রতিভার যেমন পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছিল, তেমনই আবার তাঁহার পাশ্চাত্ত্য ভাবপ্রবণতাও পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকে ও 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যে তিনি বহুল পরিমাণে সংস্কৃত কাব্যসমূহের ভাব ও রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা' ব্যতীত এই সময়কার তাঁহার সমস্ত গ্রন্থেই প্রাচ্য ভাব অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য ভাব ও রীতি অধিক অবলম্বন করিয়াছিলেন।

'মেঘনাদবধে' বর্ণিত বিষয় রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিলেও মধুসূদন তাঁহার কাব্যে অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য কবিগণের রীতি ও ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। কাজেই 'মেঘনাদবধে' বর্ণিত বিষয়ের সহিত রামায়ণের বহু ঘটনার মিল নাই। 'মেঘনাদ-বধে' রাক্ষসদিগের চরিত্রবর্ণনাকালে তিনি রামায়ণের পন্থা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার বর্ণিত রাক্ষসেরা রামায়ণে বর্ণিত নরমাংসপ্রিয় বীভৎস আচারসম্পন্ন জীব নহে। 'মেঘনাদ-বধে' বর্ণিত রাক্ষসেরা আর্য্যসমাজভুক্ত সভ্য মানবদিগের

ন্যায়ই আচারসম্পন্ন। 'ইলিয়াড' ও 'ইনিয়াড' ইত্যাদি পাশ্চত্ত্য কাব্যসমূহের অনেক ঘটনা পরিবর্ত্তিত আকারে 'মেঘনাদবধে' স্থানলাভ করিয়াছে। রামায়ণ হইতে ইহার আদর্শও ভিন্ন। কবি তাঁহার এই কাব্যে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ অপেক্ষা রাক্ষস-দিগের প্রতিই বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

'মেঘনাদবধ' কাব্যে নয় সর্গে তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কবির বর্ণনাগুণে এই স্বল্প সময়ের ঘটনাও অতি দীর্ঘ কালের ঘটনা বলিয়া মনে হয়।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'মেঘনাদবধ' কাব্য সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছেন: "সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানাদশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে কুসুমচয়নপূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমুদয় কুসুমে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্নসহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।"

দোষ ও গুণ একত্র করিয়া 'মেঘনাদবধ' যে বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ইহার অনেক ভাব ও ঘটনা রামায়ণ হইতে গৃহীত না হইয়া নানা বিদেশীয় কাব্য হইতে গৃহীত বলিয়া কোন কোন সমালোচক মধুসূদনের প্রতিভা ও মৌলিকতা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, 'মেঘনাদবধে'র সর্ব্বত্র যখন বিদেশীয় কাব্যের ছায়া বর্ত্তমান, তখন ইহাতে কবির মৌলিক কৃতিত্ব কোথায়? কিন্তু আমাদের কথা এই যে, কতকগুলি মৃতজীবের দেহ হইতে কঙ্কাল গ্রহণ করিয়া যেমন নূতন জীব সৃষ্টি করা কঠিন

ব্যাপার, সেইরূপ অন্যান্য কাব্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া একখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কাব্যরচনাও তদ্রূপ কঠিন ব্যাপার। এই বিশ্বরাজ্যে উপাদানের অভাব নাই, তাহা হইতে উপযুক্ত মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া নূতন কিছু সৃষ্টি করার মধ্যে প্রকৃত সৃজনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

মধুসূদন যেভাবে তাঁহার এই কাব্যে শব্দ ও ভাব সন্নিবিষ্ট কয়িয়াছেন, তাহাতে সত্য সত্যই বঙ্গভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়াছে। তিনি যে তাঁহার কাব্যে বীরত্বপূর্ণ ভাষা ও ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই বাংলা ভাষা ও জাতির গৌরবের বস্তু।

কবি তাঁহার এই কাব্যের প্রথমেই যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে। যতদিন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য থাকিবে, ততদিন তাঁহার এই কাব্য অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং ততদিন গৌড়জন—

“আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।”

গুণগ্রাহী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মধুসূদন বাংলা ভাষাকে কি অমূল্য সম্পত্তি উপহার দিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমতঃ ‘মেঘনাদবধে’র অনুকূলে মত প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু অবশেষে তাঁহার সেই মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং তিনি মধুসূদনের রচনার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মহাভারতের অনুবাদক মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত মধুসূদনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি মধুসূদনের রচনার

বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 'বিদ্যাৎসাহিনী সভা' নামে একটি সাহিত্যসভা স্থাপনা করিয়াছিলেন। কলিকাতার বহু বিদ্বান্, কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভার সভ্য ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সভার পক্ষ হইতে মধুসূদনকে প্রকাশ্য-ভাবে অভিনন্দন প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

এই উদ্দেশ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের ও বাংলা-দেশের সাধারণ শিক্ষিতমণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে মধুসূদনকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র ও একটি রৌপ্যনির্ম্মিত মূল্যবান্ পানপাত্র উপহার প্রদান করিলেন। এতদিন মধুসূদনের বন্ধুগণ ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার প্রতিভার আদর করিয়া আসিতেছিলেন, এইবার কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

এক বৎসরের মধ্যেই 'মেঘনাদবধে'র প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মধুসূদন যে একদিন বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হইবেন, তাঁহার বাল্যের চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা এইবার চরিতার্থ হইল।

সাধারণতঃ দেখা যায়, প্রতিভাবান পুরুষেরা তাঁহাদের জীবিত-কালে যথাযোগ্য সম্মান প্রাপ্ত হন না, মৃত্যুর পর তাঁহাদের ভাগ্যে সেই সম্মানলাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার জীবনকালেই সেই সম্মান বহুলাংশে লাভ করিয়া গিয়াছেন।

'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য একসঙ্গে রচনা অতীব বিস্ময়ের বিষয়। একদিকে বীরত্বের বজ্রনির্ঘোষ, অপরদিকে

মৃদঙ্গ, বংশী ও করতালের শ্রবণসুখকর মধুর ধ্বনি, একদিকে রণক্ষেত্রের ভয়াবহ বর্ণনা ও স্বর্গনরকাদির চিত্রাঙ্কন, অপর দিকে মলয়মারুতসেবিত, যমুনাকল্লোলমুখরিত, মধুর পিকরব-নিনাদিত বৃন্দাবনের মধুময় বর্ণনা সত্যসত্যই পাঠকের চিত্তকে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে উদ্বেলিত করিয়া তোলে।

বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। রাধিকা তাঁহার বিরহে কাতরা, তাঁহার নয়নে সর্ব্বদাই বিরহের অশ্রু ঝরিতেছে। কবি তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে এই শ্যাম-বিরহিণী রাধিকার করুণমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। আঠারটি কবিতায় 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার ভাষা মধু-সূদনের রচিত অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর সুমধুর ও সংস্কৃত-ভাবাপন্ন। বোধ হয় জয়দেব ও বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণে মধুসূদন তাঁহার এই কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন।

উদয়পুরের অধীশ্বর রাণা ভীমসিংহের দুহিতা কৃষ্ণকুমারীর জীবনের করুণ বিষাদময় কাহিনী লইয়া 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীর অনুপম সৌন্দর্য্য ও রূপলাবণ্যের জন্য লোকে তাঁহাকে 'রাজস্থানের কুসুম' বলিয়া ডাকিত। কৃষ্ণকুমারীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া জয়পুরের অধীশ্বর জগৎসিংহ এবং মরুদেশের অধীশ্বর মানসিংহ উভয়েই তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়া উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে, কৃষ্ণকুমারীকে না পাইলে তাঁহারা উদয়পুর ধ্বংস করিবেন। রাণা ভীমসিংহ তখন এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রবলপ্রতাপশালী বিপক্ষের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষার উপায় না দেখিয়া তিনি কৃষ্ণকুমারীর

জীবননাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি তাঁহার হত্যার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। বিষপানে কৃষ্ণকুমারীর জীবনান্ত হইল। ইহাই কৃষ্ণকুমারীর জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বিষপানের পরিবর্ত্তে খড়্গাঘাতে কৃষ্ণকুমারীর জীবনাবসান ঘটাইয়াছেন। মধুসূদনের রচিত নাটকাবলীর মধ্যে 'কৃষ্ণকুমারী'ই প্রধান। করুণরসের পরিবেশনে মধুসূদন যে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, 'কৃষ্ণকুমারী'ই তাহার প্রমাণ।

কালপ্রভাবে সমস্ত জিনিসেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের ফলে মধুসূদনের নাটকসমূহের এখন আর তেমন আদর নাই। কিন্তু এককালে উহা বঙ্গসাহিত্যের যে উপকার করিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইবার বিষয় নহে। মধুসূদনই সেই সময় বাংলা নাটকরচনায় নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন।

তখনও মধুসূদন পুলিশ আদালতে কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার চাকুরির বেতন, পুস্তকের আয় ও পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে যে টাকা আসিত, তাহাতেই একটি মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ হওয়ার কথা। কিন্তু অমিতব্যয়িতার জন্য তাহাতেও তাঁহার কুলাইত না।

মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর মধুসূদনের একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মধুসূদন তখন বঙ্গদেশের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জনসমাজে আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আয়ও কম ছিল না। পারিবারিক জীবনে যাহা কিছু থাকিলে মানুষ সংসারে সুখী হয় ও শান্তিলাভ করিতে পারে, মধুসূদনের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু তথাপি মধুসূদনের মনে শান্তি ছিল না, তিনি দিবারাত্র মানসিক অশান্তির আগুনে পুড়িয়া মরিতেছিলেন। ধন, মান, পারিবারিক স্নেহ ও ভালবাসা—কিছুই তাঁহাকে তৃপ্তি ও শান্তি দান করিতে সমর্থ হয় নাই। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় মধুসূদনের রচিত 'আত্মবিলাপ' নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই কবিতায় কবি অকপটে তাঁহার অন্তরের অশান্তি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কবিতাটি এইরূপ :

(১)

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়! তাই ভাবি মনে!
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়, ফিরাব কেমনে?

দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন ;—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল্ না ;—একি দায় !

(২)

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ? জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি কতদিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে নিত্য কি রে ঝলমলে,—
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

(৩)

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ? জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে।
মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষ্ণা-ক্লেশে ;
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

(৪)

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে ; কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

(৫)

বাকি কি রাখিলি, তুই ! বৃথা অর্থ-অন্বেষণে, সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কন্টকগণে কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী ;
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন ! কেমনে ?

(৬)

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়, কব তা কাহারে ?
সুগন্ধিকুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায় কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি ফল অনাহারে অনিদ্রায় ?

(৭)

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জলতলে ফেলিস্ পামর !
ফিরি দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন ?
হায়রে ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে ?"

মনের এইরূপ অবস্থা লইয়া যে মধুসূদন কাব্যরচনা করিতে পারিতেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ-রচনাই তাঁহাকে জীবনে শান্তি দান করিত। হৃদয়ের অশান্তি কথঞ্চিৎ নিবারণ করিবার জন্যই তিনি গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত হইতেন। তাঁহার জীবন যখন এইরূপ দারুণ অশান্তিতে অতিবাহিত হইত, সেই সময়ে আর একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচিত হইয়াছিল।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যে বীররস ও কোমল রসের অপূর্ব্ব সম্মিলন পরিদৃষ্ট হয়। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে তিনি যে বীররসের এবং 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে যে কোমল রসের অবতারণা করিয়াছিলেন, এই উভয় রসের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে রচিত হইয়াছিল 'বীরাঙ্গনা' কাব্য। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে সেই জন্যই যেমন একদিকে বনবাসিনী

ঋষিকন্যা বিরহবিধুরা শকুন্তলার বিরহপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে, তেমনই আবার 'বীরাঙ্গনা' জনার তেজোপূর্ণ তিরস্কার-বাণী ঘোষিত হইয়াছে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্য 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের যোগসূত্রস্বরূপ এবং এই কাব্য মধুসূদনের একটি অমর কীর্ত্তি। এই গ্রন্থখানি পুরাণে বর্ণিতা প্রসিদ্ধা মহিলাগণের পত্রচ্ছলে রচিত।

'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'সোমের প্রতি তারা', 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণী', 'দশরথের প্রতি কৈয়েয়ী', 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা', 'অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী', 'দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী', 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা', 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী', 'পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী', এবং 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'—এই একদশটি পত্র কবিতাকারে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ১৮৬১ সালে রচিত এবং পর বৎসর প্রকাশিত হয়। কবি এই গ্রন্থখানি দীনশরণ প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে উৎসর্গ করেন।

ভাষার মাধুর্য্যে ও লালিত্যে 'বীরাঙ্গনা' কাব্য মধুসূদনের রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার পর বঙ্গদেশের বহু বিখ্যাত কবিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য ও কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই মধুসূদনের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন এবং ইহার উৎকর্ষসাধন—এই উভয় গৌরবই মধুসূদনের প্রাপ্য। ইংরেজী ভাষায় যিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা ঐ ছন্দের উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই, পরবর্ত্তী কবিগণের দ্বারাই

তাহা হইয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন একাই এই উভয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মধুসূদন মহাভারতের কোন ঘটনা এবং সিংহলবিজয় অবলম্বন করিয়া আরও দুইখানা কাব্যরচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন এবং দুইখানিরই প্রথমাংশ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কোনখানিই সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মধুসূদন নানাভাবে যে অর্থ উপর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অর্থক্লেশ থাকিবার কথা নহে। কেবল তাঁহার অমিতব্যয়িতার জন্যই তাঁহাকে অর্থক্লেশের দাবদাহ সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার মনে হইত, অর্থকষ্ট দূর করিতে পারিলেই জীবনে তিনি শান্তি পাইতে পারিবেন। শৈশব হইতেই মধুসূদনের আকাঙ্ক্ষা ছিল বিলাতে গিয়া তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবেন। এইবার তিনি ভাবিতে লাগিলেন ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে পারিলে তাঁহার অর্থকষ্ট দূরীভূত হইবে। এইজন্য তিনি বিলাত গমনের সঙ্কল্প করিলেন।

মধুসূদনের পিতা যে ভূ-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, মধুসূদন তাঁহার পিতৃব্যপুত্রদিগের সহিত মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া ঐ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই সম্পত্তি পত্তনি দিয়া তিনি বিলাত গমনে অভিলাষী হইলেন। এইরূপ স্থির হইল যে, পত্তনিদার মধুসূদনকে বিলাত গমনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিছু টাকা অগ্রিম প্রদান করিবেন এবং তাঁহার পত্নীপুত্রাদির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য মাসিক দেড়শত টাকা করিয়া দিবেন।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া মধুসূদন ১৮৬২ সালের ৯ই জুন 'ক্যাণ্ডিয়া' নামক জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি দ্বারা বঙ্গভূমির নিকট বিদায় লইয়াছিলেন ঃ

বঙ্গভূমির প্রতি

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে;
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মন-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে।

এগার

স্বদেশের শ্যামল ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া মধুসূদন সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইলেন। ধীরে ধীরে ভারতের সীমারেখা বিলীন হইয়া গেল। তিনি সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্মভূমি দর্শন করিতে যাইতেছেন—এই আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভরপূর।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষভাগে মধুসূদন বিলাতে পৌঁছিলেন। তিনি 'গ্রেস্ ইন্' নামক প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারসমাজে প্রবেশ করিলেন।

মধুসূদনের জীবন চিরকালই দুঃখে অতিবাহিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে আসিয়াও তিনি এই দারিদ্র্যদুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই। বিলাতে বাস সহজ ব্যয়সাধ্য নহে। তিনি আদ্যোপান্ত চিন্তা না করিয়া কেবল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া এই প্রকার ব্যয়সাপেক্ষ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এইপ্রকার কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময় তাঁহাকে সাহায্য না করিলে হয়ত ঋণের দায়ে বিদেশের কোন কারাগারে বা দরিদ্রনিবাসে অতি কষ্টে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিত।

যাহাদিগকে পৈতৃক সম্পত্তি পত্তনি দিয়া এবং অর্থের ব্যবস্থা করিয়া মধুসূদন ইউরোপ গমন করিয়াছিলেন, মধুসূদনের স্বদেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা তাহাদের

কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে বিরত হইল। মধুসূদন পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের নিকট পত্র লিখিয়াও অর্থসাহায্য পাওয়া ত দূরের কথা, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পাইলেন না।

মধুসূদন পত্নী এবং পুত্রকন্যাদিগের মাসিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য সম্পত্তির পত্তনিদারের নিকট হইতে যে অর্থের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই অর্থপ্রাপ্তি হইতেও বঞ্চিত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের কষ্টের সীমা-পরিসীমা রহিল না। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে দেখিয়া মধুসূদনের পত্নী পুত্র ও কন্যাকে লইয়া স্বামীর নিকট গমনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। মধুসূদনের স্বদেশ-ত্যাগের এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পুত্র ও কন্যাকে লইয়া স্বামীর নিকট ইংলণ্ডে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাতে মধুসূদনের বিপদের উপর আরও বিপদ উপস্থিত হইল।

সপরিবারে বিলাতে বাস অতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, তাহার উপর আবার মধুসূদন অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সঞ্চিত অর্থ শেষ হইয়া গেল এবং প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অলঙ্কার, বস্ত্র, গৃহসামগ্রী ইত্যাদি সমস্তই ক্রমে গভর্ণমেণ্ট বন্ধক-অফিসে আবদ্ধ হইল। অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবর্ত্তনের জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁহাকে যে রৌপ্যনির্ম্মিত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহাও বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ফরাসী ভাষাশিক্ষার সুবিধার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ হইবে বলিয়া এবং পত্নীর স্বাস্থ্যের

জন্য মধুসূদন ফ্রান্সের অন্তর্গত ভার্সেল্‌স্‌ নগরে গিয়াছিলেন। অর্থাভাবে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। এই ভার্সেল্‌সে অবস্থানকালে মধুসূদনের আর্থিক দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছিল।

ভার্সেল্‌সে মধুসূদনের এমন দিনও গিয়াছে যে, কোন কোন দিন তাঁহাকে অনশনে দিনপাত করিতে হইয়াছে। একটি ফরাসী মহিলা এই সময়ে তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার বড়ই উপকার করিয়াছিলেন। একটি দাতব্য সমিতি মধুসূদনের দুরবস্থা অবগত হইয়া গোপনে গোপনে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা মধুসূদনের অজ্ঞাতে তাঁহার গৃহদ্বারে আহার্য্য সামগ্রী ও শিশুদিগের জন্য দুগ্ধ রাখিয়া আসিতেন। কিন্তু এইরূপ করিয়া বেশি দিন চলা সম্ভব নহে।

অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া মধুসূদন অবশেষে দরিদ্রের পরম বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী পড়িতে যাওয়ায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। মধুসূদনের পত্র পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন মধুসূদনকে পাঠাইবার মত উপযুক্ত অর্থ তাঁহার নিকট ছিল না। তিনি ঋণ করিয়া মধুসূদনকে পনর শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পরেও আরও কয়েকবার তিনি মধুসূদনের সাহায্যের জন্য টাকা পাঠাইয়াছিলেন। মধুসূদন এই ঋণের সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে পারেন নাই, কিয়দংশমাত্র পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রধানতঃ ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় শিক্ষা করাই যদিও মধুসূদনের বিলাত গমনের উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি ইউরোপীয় ভাষাসমূহ শিক্ষা করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ব্যারিষ্টারী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। বিলাতে গমন করিয়াও তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ কবিতা রচনা হইতে নিরস্ত হন নাই। ইংরেজী, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া তিনি অবসর-সময় অতিবাহিত করিতেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগকে ভারতীয় কাব্য হইতে রত্ন আহরণ করিয়া উপহারপ্রদানের জন্য তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি রামায়ণের সীতাদেবীর চরিত্র-অবলম্বনে ইংরেজী ভাষায় একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় তিনশত পংক্তি রচনা করিয়াই তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

'সীতা' কাব্য ব্যতীত কতকগুলি ইংরেজী খণ্ডকবিতাও তিনি ইউরোপে বাসকালে রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা-ভাষাতেও 'সুভদ্রাহরণ' ও 'দ্রৌপদীর স্বয়ংবর' নামক দুইখানি নূতন কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই দুইখানি কাব্যের কোনখানিই তিনি শেষ করিতে পারেন নাই। 'সুভদ্রাহরণ' শেষ করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতা-বলীতে লিখিয়াছিলেন :

"তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নবতানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রাসুন্দরি !
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে ! আশার লহরী—
শুকাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে।"...ইত্যাদি

'বীরাঙ্গনা' কাব্যে আরও কয়েকটি কবিতা সংযোজিত করিয়া কাব্যখানি সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টাও কবি ইউরোপে প্রবাসকালে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টাও সফল হয় নাই। ইউরোপে প্রবাসকালে তিনি কেবল চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীই শেষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় বঙ্গভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর প্রবর্ত্তনও মধুসূদনের এক নূতন কীর্ত্তি। ইহার পূর্ব্বে এইরূপ কবিতার প্রচলন বঙ্গভাষায় ছিল না। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' নানা বিষয়ের চুরানব্বইটি কবিতার সমবায়ে সংগঠিত। ইহার অনেক কবিতায়ই তাঁহার হৃদয়ের একান্ত নিজস্ব অনুভূতি অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে।

মধুসূদনকে ভালভাবে চিনিতে হইলে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। মধুসূদন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও হিন্দুভাব তাঁহার হৃদয়ে কিরূপে বিরাজিত ছিল এবং বৈদেশিক আচারব্যবহার অনুকরণ করিলেও স্বদেশানুরাগ তাঁহার হৃদয়ে কতদূর প্রবল ছিল, এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায়।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর সঙ্গেই মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন একপ্রকার শেষ হইয়াছিল। ইহার পর তিনি আর যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে নাই।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

বার

পাঁচ বৎসরকাল ইউরোপে প্রবাসের পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মধুসূদন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যাহাতে মধুসূদনের কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে সুবিধা হয়, সে জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এবং অন্যান্য বন্ধুগণের সাহায্যে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারীতে প্রবেশ করেন।

ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া মধুসূদন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন।

মধুসূদন এখন 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কবি, ছয়টি ইউরোপীয় ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁহার প্রবাসকালের মধ্যে তাঁহার কাব্যসমূহের যশঃসৌরভ সমগ্র বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মধুসূদন ব্যারিষ্টারীতে প্রবৃত্ত হওয়ায় বঙ্গসাহিত্যের নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দ্বারা তাঁহার অবলম্বিত ব্যবসায় বিন্দুমাত্র লাভবান্ হয় নাই। এমন কি, এই আইনব্যবসায়-অবলম্বন দ্বারা তিনি নিজের আর্থিক অবস্থারও উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই। মধুসূদন ছিলেন তাঁহার সমকালবর্ত্তী ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু আইনব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে হইলে বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে অপর যে সমুদয় গুণ থাকা প্রয়োজন, মধুসূদনের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল।

তিনি ছিলেন কল্পনাপ্রিয় কবি। তিনি কল্পনার চক্ষে বিশ্বজগৎ নিরীক্ষণ করিতেন। ব্যবহারশাস্ত্রের কূটতর্ক তাঁহার স্বাভাবিক কবিপ্রকৃতির উপযুক্ত ছিল না। ব্যারিষ্টারদিগের ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে বিশেষ বাক্‌পটুতা, ছল, চাতুরী ও কৌশল আবশ্যক, কিন্তু মধুসূদনের মধ্যে এই সকলের কিছুই ছিল না। অনেক বিষয়ে তাঁহার স্বভাব এইরূপ ছিল যে, তাহা ব্যবহারাজীবের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। কি করিয়া বিচারকগণের মনস্তুষ্টিবিধান করিয়া কার্য্যসাধন করিতে হয়, সে কৌশল মধুসূদন জানিতেন না। বিকৃত কণ্ঠস্বরও মধুসূদনের ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য না হইবার অন্যতম কারণ। বিচারকগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মোটেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। এই সকল কারণে মধুসূদন ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে তিনি যে একেবারেই অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার ন্যায় একজন পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে যতদূর কৃতকার্য্য হওয়া উচিত, মধুসূদনের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই।

প্রথম প্রথম ব্যবসায়ে মধুসূদনের উন্নতির আশার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই তিনি সুকবি বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক ব্যারিষ্টারগণ অপেক্ষা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সুবিধা করিতে পারিয়াছিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মাসিক আয় একহাজার টাকা হইতে দেড় হাজার টাকায় উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার পর আর উন্নতি হয় নাই, বরং অবনতি হইয়াছিল। শেষে এত অবনতি হইল যে, উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি

প্রিভি-কাউন্সিলের অন্যতম অনুবাদকের কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মধুসূদন অর্থের সচ্ছলতা লাভ করিবার জন্য বাগ্দেবীর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কমলাদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আশাও ফলবতী হয় নাই।

ইউরোপ হইতে ফিরিয়া মধুসূদন মাত্র ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন। এই ছয় বৎসর তাঁহার অর্থচিন্তাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল, এইসময় তিনি বাংলা সাহিত্যের জন্য বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার ন্যায় কবির পক্ষে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে একেবারে দূরে সরিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। ইউরোপে প্রবাসকালের ন্যায় এখনও দুই-তিনটি নূতন বিষয় অবলম্বন করিয়া তিনি গ্রন্থরচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনখানিই শেষ করিতে পারেন নাই। এই তিনখানি গ্রন্থের প্রথমখানি 'নীতিমূলক কবিতামালা', দ্বিতীয়খানি 'হেক্টরবধ', তৃতীয়খানি 'মায়াকানন'। নীতিমূলক কবিতাগুলি 'ঈশপস্ ফেবল্স'-এর আদর্শে বাংলা কথামালার অনুকরণে লিখিত হইয়াছিল। অর্থাভাবক্লেশ দূর করিবার আশায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে মধুসূদন ইহা রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতার মধ্যে অনেকগুলিই সুন্দর। এই কবিতাগুলি মধুসূদন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দেই 'হেক্টরবধ'ও প্রকাশিত হয়। ট্রয়-রাজকুমার মহাবীর হেক্টরের মৃত্যুর বিষয় লইয়াই গ্রন্থখানি রচিত। ইহা বাংলা গদ্যভাষায় লিখিত। কিন্তু বাংলা গদ্যরচনা মধুসূদনের

কবিপ্রকৃতির অনুকূল ছিল না। এই জন্য ইহাতে বহু দোষ-ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। পুস্তকের ভাষা ব্যাকরণদুষ্ট, গ্রাম্যতা-পূর্ণ এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবে অনুপ্রাণিত। সেই জন্য ইহা পাঠকের রুচিকর হয় নাই। 'হেক্টরবধ'রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনও প্রায় শেষ হইয়া যায়।

ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধুসূদন ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে পাঁচ বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টারী দ্বারা তিনি যেরূপ আয়ের আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ ঘটে নাই। অথচ তিনি তাঁহার অতিরিক্ত ব্যয়ের সঙ্কোচসাধনও করিতে পারেন নাই। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তাঁহার যে আয় হইত, তাহা যদি তিনি সংযতভাবে ব্যয় করিতেন, তবে তাঁহাকে অর্থকষ্টে পড়িতে হইত না। কিন্তু তাঁহার পরিণামচিন্তা একেবারেই ছিল না। ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া নিতান্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া সামান্য কারণে অথবা অকারণে তিনি বিপুলভাবে অর্থব্যয় করিয়া ফেলিতেন। হাতে একপয়সাও না রাখিয়া তিনি এমন বিবেচনাহীনভাবে অর্থব্যয় করিতেন যে, পরের দিন তাঁহাকে সাংসারিক ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ঋণ করিবার নিমিত্ত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইত। তিনি ঋণ করিতেন বটে, কিন্তু সেই ঋণপরিশোধের তাঁহার তেমন আগ্রহ ছিল না।

যে পৈতৃক সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি ইউরোপে প্রবাসকালে ঋণ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই বিক্রয় করিয়াও ঋণ পরিশোধিত হয় নাই। ব্যয়ের অনুরূপ তাঁহার আয় ছিল

না, সুতরাং ক্রমশঃ তাঁহার ঋণভারবৃদ্ধির সহিত তাঁহার মানসিক অশান্তিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মধুসূদন যে কেবল তাঁহার বিলাসবাসনা বা উচ্ছৃঙ্খলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতেন, তাহা নহে। বহু সদনুষ্ঠানে ও বহু প্রার্থীকেও তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার আদৌ মমতা ছিল। প্রার্থীকে কখনও তিনি গণনা করিয়া টাকা দিতেন না, এক বা দুই মুঠিতে যাহা উঠিত, তাহাই তিনি দিয়া ফেলিতেন। যতক্ষণ তাঁহার কিছু সম্বল থাকিত, পরিণাম না ভাবিয়া সৎকার্য্যেই হউক বা অন্য যে কোন কার্য্যেই হউক, ধূলিমুষ্টির ন্যায় তিনি তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিতেন।

মধুসূদন কখনও হয়ত স্বীয় সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কিছু ঋণ করিয়া আনিয়াছেন, তখন কোন প্রার্থী আসিয়া কিছু প্রার্থনা করিল, অমনি মধুসূদন প্রার্থীর আশাতিরিক্ত দান করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

একবার মধুসূদনের কোন বাল্যসুহৃদ তাঁহার পরিচিত এক ব্যক্তিকে লইয়া তাঁহার নিকট একটি মোকদ্দমার পরামর্শের জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহাকে যথোচিত পরামর্শ দান করিলেন। অবশেষে সেই ব্যক্তি যখন মধুসূদনকে পারিশ্রমিক দিতে চাহিলেন, মধুসূদন কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিলেন না। অথচ সেইদিন মধুসূদন একেবারে রিক্তহস্ত ছিলেন, একটি টাকাও তাঁহার হাতে ছিল না।

সেই ব্যক্তি চলিয়া গেলে মধুসূদন তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন : "তুমি যখন তোমার পরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ,

তখন কি আমি তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইতে পারি ? অথচ আজ আমার হাতে একটি পয়সাও নাই, অদ্যকার সংসারব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তুমি আমাকে পাঁচটি টাকা ধার দিয়া যাও।”

শেষ অবস্থায় তিনি ঋণভারে ভয়ানকভাবে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সামান্য দাসদাসী ও দোকানদার হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত—অনেকের নিকট হইতেই তিনি ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঋণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মানসিক অশান্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই মানসিক অশান্তিনিবারণের জন্য মধুসূদন হয় কবিতা-রচনায় নিরত হইতেন, নতুবা বসিয়া বসিয়া মদ্যপান করিতেন। কবিতারচনায় যখন তাঁহার হৃদয়ের দাবানল নির্ব্বাপিত হইত না, তখনই তিনি অতিরিক্তভাবে মদিরার আশ্রয় লইতেন।

একদিন ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় মধুসূদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন, মধুসূদন একটি ঘরে বসিয়া উহার দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া জলশূন্য অতি উগ্র মদ্য পান করিতেছেন। মনোমোহনবাবু মধুসূদনের নিকট যাইয়া বলিলেন ঃ “একি ! আপনি একি করিতেছেন ! আপনি কি জানেন না যে, ইহার পরিণাম কি হইবে ?”

মধুসূদন বলিলেন ঃ “এই দ্বিপ্রহরের সময় এরূপ মদ্য-পানের পরিণাম কি, তাহা আমি বেশ জানি, কিন্তু আমার আর অন্য উপায় নাই। ক্লেশ অল্প বলিয়াই আমি অস্ত্রের পরিবর্ত্তে মদ্যের আশ্রয় লইয়াছি।”

এইরূপ অত্যাচারে ও শারীরিক নিয়মলঙ্ঘনের ফলে অল্প-দিনের মধ্যেই মধুসূদন নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। উদরী, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ইত্যাদি নানা দুরারোগ্য ও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ভগবানের করুণায় তিনি সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু অনিয়ম ও অমিতাচারের ফলে তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন! ইহাকে ভগবানের অভিসম্পাত বলা যাইতে পারে।

ব্যাধির যন্ত্রণা মধুসূদনকে যতটা কাতর করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর কাতর করিয়াছিল ঋণের দায়ে তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণের জন্য ঋণদাতাদের ভীতিপ্রদর্শন। ইহাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ ও অশান্তির কারণ হইয়াছিল। ঋণদায়ে কারাগারে মৃত্যু অপেক্ষা আত্মহত্যা করাই তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন।

ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে আর উন্নতির আশা নাই দেখিয়া মধুসূদন এই সময়ে মানভূমের অধীন পঞ্চকোটের রাজার আইন-উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যটি স্থায়ী হইলে মধুসূদনের অর্থাভাব অনেকটা দূরীভূত হইত। কিন্তু রাজার ব্যবহারে কিছুদিন পরেই তিনি এই কার্য্যটি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

তের

পঞ্চকোটের চাকরি পরিত্যাগ করিয়া মধুসূদন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

ব্যাধির আক্রমণে তাঁহার শরীর পূর্ব্ব হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তিনি আর রীতিমত ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় চালাইতে পারিলেন না।

১৮৭৩ সালে ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসার পর তাঁহার রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। মধুসূদনের পত্নীও এই সময়ে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রোগাক্রান্ত, চিকিৎসা ও পথ্যের অভাব, শিশু দুইটির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহার উপর ঋণদাতাদের নিপীড়ন, সুতরাং মধুসূদনের জীবন একেবারে দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল।

এতদিন বন্ধুগণের প্রদত্ত সাহায্য ও ঋণগ্রহণের উপর নির্ভর করিয়াই মধুসূদনের দিন চলিতেছিল, কিন্তু তাহারও আর আশা ছিল না। পরের প্রদত্ত অর্থের উপর নির্ভর করিয়া আর কয় দিন চলে? গৃহসজ্জা, পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া কিছুদিন কোনপ্রকারে চলিল, কিন্তু সে সম্বলও ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া আসিল। এই সময়ে সত্য সত্যই তাঁহাদের অন্নাভাব উপস্থিত হইল। প্রায়ই তাঁহাদিগকে অনশনে কাটাইতে হইত।

বঙ্গরঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ এই সময় তাঁহাকে অভিনয়োপযোগী নাটক লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সে সময়ে

মধুসূদনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নাটক লিখিবার উপযোগী ছিল না। কেবল অর্থাভাব দূর করিবার জন্যই তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই নাটকখানির নাম 'মায়াকানন'। কিন্তু তিনি স্বয়ং ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরে বঙ্গরঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ তাহা শেষ করিয়া কবির মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশ কয়িয়াছিলেন।

'মায়াকাননে' মধুসূদনের নিজের বিষাদময় জীবনই প্রতি-বিম্বিত হইয়াছে। মধুসূদনের জীবনের ন্যায় এই নাটকখানিও মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিপূর্ণ।

সিন্ধুদেশে মায়াকানন নামে একটি গভীর অরণ্য ছিল। সেই অরণ্যে অরণ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর এক পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মায়াকানন সম্বন্ধে সিন্ধুদেশে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, যে লগ্নে সূর্য্যদেব কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই লগ্নে যদি কোনও পবিত্রস্বভাবা কুমারী কি কোনও পবিত্রস্বভাব অতিবাহিত যুবক ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, তবে তিনি কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ স্বামীকে, আর পুরুষ হইলে আপনার পত্নীকে দেখিতে পান।

একদিন সিন্ধুদেশের রাজপুত্র অজয় ও গান্ধার দেশের রাজকুমারী ইন্দুমতী উভয়েই আপন আপন ভবিষ্যৎ পত্নী ও পতি-সন্দর্শনের আশায় পরস্পরের অজ্ঞাতে মায়াকাননে প্রবেশ করিয়া উভয়কে দেখিতে পান। কিন্তু অজয় ও ইন্দুমতীর মিলন ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। পরস্পরের প্রথম সাক্ষাতের দুইবৎসর পরে উভয়েই মিলনে নিরাশ হইয়া দেবীর সম্মুখে

আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।—ইহাই 'মায়াকানন'-এর বর্ণিত বিষয়।

মধুসূদনের মনে তখন আত্মহত্যা করিয়া শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল, তাই 'মায়াকাননে'ও তিনি সেই ভাবই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

যে অবস্থার মধ্যে 'মায়াকানন' রচিত হইয়াছিল, তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। রোগের যন্ত্রণায় কখনও মধুসূদন অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন, রক্তবমনে শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, অথচ সেই অবস্থায়ও কেবল অর্থকষ্ট দূর হইবে, এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি 'মায়াকানন' রচনা করিয়াছিলেন। নিজের যখন লেখনীধারণের শক্তি থাকিত না, তখন কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহার দ্বারাই কোন কোন অংশ লিখাইয়া লইতেন। এরূপ অবস্থায় গ্রন্থ যে নির্দ্দোষ ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

'মায়াকানন'-এর ন্যায় 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামক আর একখানি নাটকও মধুসূদন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বঙ্গরঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ মধুসূদনকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা তাঁহার সাময়িক যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভাব স্থায়িভাবে দূরীভূত হয় নাই।

মধুসূদন তখন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথিতযশা লেখক, প্রায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তির সহিতই তিনি বিশেষরূপে

পরিচিত। মধুসূদন তখন যদি সাহায্যের জন্য তাঁহাদের কাছে আবেদন জানাইতেন, তবে যথেষ্ট অর্থাগম হইত। কিন্তু মধুসূদনের সে প্রবৃত্তি ছিল না। নিজের দুরবস্থা সাধারণের গোচরীভূত করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তিনি বরং সপরিবারে অনাহারে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু নিতান্ত আত্মীয় ও সুহৃদ ব্যতীত কাহারও নিকট কখনও নিজের দুরবস্থা জ্ঞাপন করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদিগেরও কোনও দোষ ছিল না, তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের দুরবস্থা সূচিত হইবার পরই তিনি কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সময়ে মধুসূদনের অনেক বন্ধুই তাঁহাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিয়াছিলেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী একবার মধুসূদনের গ্রন্থাবলী উপহার পাইয়া কবিকে পাঁচশত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বদেশবৎসল ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মধুসূদনকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে মধুসূদনের দুর্দ্দশা আরও চরমে উঠিত, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে মধুসূদনের শিশুসন্তান দুইটিকে সত্য সত্যই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋণদাতাদিগের উৎপীড়ন মধুসূদনের পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য মধুসূদন কিছুদিনের জন্য কলিকাতা হইতে অন্যত্র যাইয়া বাস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে উত্তরপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায় মধুসূদনের দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় যাইতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে মধুসূদন তথায় গমন করিয়া গঙ্গাতীরস্থ প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী-গৃহে তিন মাসকাল বাস করিয়াছিলেন।

জয়কৃষ্ণ বাবু, তাঁহার পুত্র রাজা প্যারীমোহন ও তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ মধুসূদনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদিগের এই সদয় সহানুভূতি ও সাহায্যে মধুসূদনের আর্থিক দুরবস্থা ও মানসিক ক্লেশ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সদ্ব্যবহারে মধুসূদন যারপরনাই পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

উত্তরপাড়ায় অবস্থানকালে মধুসূদন একপ্রকার মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ছিলেন। সেই অবস্থাতেও তাঁহার কবিতানুশীলনের বিরাম ছিল না। যেদিন তিনি একটু সুস্থ থাকিতেন, সেদিন তাঁহার প্রিয় কবি দান্তে ও মিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থবিশেষ হইতে কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন। কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন।

মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বাবু প্রায়ই মধুসূদনকে দেখিবার জন্য উত্তরপাড়ায় যাইতেন। একদিন তিনি যাইয়া দেখিলেন, মধুসূদন একটি মলিন শয্যার উপর পড়িয়া রক্ত বমন করিতেছেন। তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা নিম্ন গৃহতলে পড়িয়া রোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন। গৌরদাস বাবু তাঁহাকে

শুশ্রূষার জন্য অগ্রসর হইলে হেনরিয়েটা বলিলেন, "মৃত্যুর জন্য আমার ভয় নাই। আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। যদি পারেন, আমার স্বামীর জীবন রক্ষা করুন।"

গৌরদাস বাবু দেখিতে পাইলেন, গৃহের এক কোণে ভুক্তাবশিষ্ট কতকগুলি অন্ন পড়িয়া রহিয়াছে। মধুসূদনের পুত্রকন্যা দুইটি তাহার দ্বারাই কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে উদর পূর্ণ করিয়াছিল। সেই ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের গন্ধে কতকগুলি মাছি আসিয়া ভন্ ভন্ শব্দে ইতস্ততঃ উড়িয়া রোগীদিগকে বিরক্ত করিতেছিল।

হায়, 'মেঘনাদবধ'-এর কবি মধুসূদনকে শেষ জীবন এইরূপ দুর্দ্দশায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল! ইহা মধুসূদনেরই স্বহস্তরোপিত বিষবৃক্ষের ফল।

উত্তরপাড়ায় মধুসূদনের পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মৃত্যুর ৭।৮ দিন পূর্ব্বে তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

চৌদ্দ

মধুসূদন আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু স্বাধীনভাবে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতে পারেন, তখন তাঁহার অবস্থা সেরূপ ছিল না। নিদারুণ রোগে তিনি একেবারে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোনও দিক হইতে একটি পয়সাও যে আসিবে, সে আশাও ছিল না।

এদিকে মধুসূদনের পত্নী হেনরিয়েটার অবস্থাও শোচনীয়। কতক্ষণে তিনি পরলোকে গমন করিবেন, তাহারই অপেক্ষা মাত্র। কে তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করিবেন, কে তাঁহাদিগকে ঔষধ ও পথ্য দিবেন ?

সুতরাং মধুসূদনের বন্ধুগণ হেনরিয়েটাকে তাঁহার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার আশ্রয়ে রাখিয়া মধুসূদনকে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণই স্থির করিলেন।

বাংলার কবিকুলচূড়ামণির ভাগ্যে শেষে এই হইয়াছিল ! এই সময় মধুসূদনের জীবন আরও ভয়ানক যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে যখনই তাঁহার সংজ্ঞা এক-একবার ফিরিয়া আসিত, তখনই শিশু দুইটি ও পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিত ! কখনও তিনি কষ্টে হৃদয়ের ভাব সংযত করিতেন, কখনও বা শিশুর ন্যায় কাঁদিতে আরম্ভ করিতেন।

ক্রমে তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর পীড়া শেষ দশায় উপনীত

হইল। কে কাহাকে ফেলিয়া আগে মহাপ্রস্থান করিবেন, তাহাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইল।

মধুসূদনের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা পরলোক গমন করিলেন। মধুসূদনের এক পূর্ব্বতন ভৃত্য আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে আসিয়া মধুসূদনকে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ প্রদান করিল। শুনিয়া মধুসূদন কাতরস্বরে কহিলেন, "হায়, ভগবান্! আমাদের দুইজনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমারও আর অধিক দিন বিলম্ব নাই, আমিও শীঘ্রই হেনরিয়েটার অনুগমন করিব।"

হেনরিয়েটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সংস্থান ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদিগের সাহায্যে তাহা একপ্রকার সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইল। মধুসূদন যে পত্নীর সমাধির উপর শেষ অশ্রুপাত করিয়া হৃদয়ের বেদনাভার লাঘব করিবেন, তাঁহার পক্ষে সেই উপায়ও ছিল না।

বাবু মনোমোহন ঘোষ ও তাঁহার আরও দুই-একজন বন্ধু হেনরিয়েটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের পর দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পাছে অর্থাভাবে পত্নীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকে, এই আশঙ্কায় মধুসূদনের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি মনোমোহনবাবুকে দেখিয়া কহিলেন, "কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিতভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি ত হয় নাই?"

মনোমোহনবাবু বলিলেন, "আমাদিগের এই অবস্থায় যাহা কিছু সম্ভব, তাহার কোন ত্রুটিই হয় নাই।"

মধুসূদন কহিলেন, "মনোমোহন, তুমি যত্নের সহিত সেক্সপীয়র পড়িয়াছ, ম্যাকবেথের সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার মনে পড়ে ?"

মনোমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ পংক্তি কয়টি ?"

মধুসূদন বলিলেন, "লেডী ম্যাকবেথের মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে ম্যাকবেথ যাহা বলিয়াছিলেন। আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কিছুই মনে পড়িতেছে না। কিন্তু দেখ দেখি, আমি সেই পংক্তি কয়টি আবৃত্তি করিতেছি, আমার কোন ভুল হয় কি না।"

এই বলিয়া মধুসূদন ম্যাকবেথ হইতে সেই পংক্তি কয়টি আবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "কেমন মনোমোহন, কোনও ভুল হয় নাই ত ?"

মনোমোহন বাবু বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে, কিছু ভুল হয় নাই। কিন্তু আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, কোনও চিন্তা নাই।"

শুনিয়া মধুসূদন একটু হাস্য করিলেন। সেই হাসির অর্থ এই যে, আর আরোগ্য লাভ করিয়াছি! আমি যে কিরূপ আরোগ্য লাভ করিব, তাহা আমিই বুঝিতেছি!

কিয়ৎক্ষণ পরে মধুসূদন মনোমোহনবাবুকে বলিলেন, "মনোমোহন, এই হাসপাতালের দাসদাসীদের সকলেই অর্থ-লোভী, অর্থ পাইলে তাহারা একটু যত্নসহকারে সেবাযত্ন করে। যদি প্রত্যহ একটি করিয়াও টাকা ব্যয় করিতে পারিতাম, তবে হয়ত একটু শান্তিতে মরিতে পারিতাম। কিন্তু আমি যে একেবারে সম্বলহীন, আমার নিকট যে একটি কপর্দ্দকও নাই!"

মনোমোহনবাবু কহিলেন, "প্রতিদিন একটি করিয়া টাকা!

আপনি নিশ্চিন্ত হউন, যেরূপেই হউক,তাহা সংগৃহীত হইবে।”

মধুসূদন বলিলেন, “মনোমোহন, তোমাকে আর কি বলিব? দেখিও, আমার শিশু দুইটি যেন অন্নাভাবে কষ্ট না পায়।”

মনোমোহনবাবু বলিলেন, “আমার সন্তানেরা যদি অন্নাভাবে কষ্ট না পায়, তোমার সন্তানেরাও পাইবে না।”

মধুসূদনের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনোমোহনবাবুর হাত ধরিয়া কহিলেন, “ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।”

ইহার পর মনোমোহনবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই সাক্ষাতের পর মধুসূদন আর মাত্র তিনদিন জীবিত ছিলেন। এই তিনদিনের অধিকাংশ সময়েই তিনি তাঁহার অতীত জীবনের কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া অতিবাহিত করিতেন।

কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি তাহার নিকট মুক্তকণ্ঠে আপনার জীবনের দোষত্রুটি স্বীকার করিতেন এবং অসদাচরণ ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণামফল কিরূপ বিষময়, তাহা উল্লেখ করিয়া তাহাকে সাবধান হইতে বলিতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবাদ দিয়া আনাইয়া মধুসূদন অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন ভগবানের নিকটে ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি সেই দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি। তিনি যে পাপীতাপীর উদ্ধারের জন্য মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্টকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।”

যে দিন মধুসূদন পরলোক গমন করেন, সেই দিন প্রাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। মধুসূদনের শরীর তখন নিস্তেজ, কথা বলিবার শক্তি প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। মধুসূদন ত্রৈলোক্যমোহনকে বলিলেন, "ত্রৈলোক্যমোহন! আমার জীবনে কোনও আশাই পূর্ণ হইল না! অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি। এখন সে-সব বলিবার শক্তি নাই; তুমি আর এক সময়ে আসিও, অনেক কথা বলিবার আছে।"

সেই দিন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার বেলা দুই ঘটিকার সময় এই অমর কবির জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। বাল্যে যাঁহার সেবার জন্য দাসদাসীরা সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিত, আজ তাঁহার এই মৃত্যুসময়ে তাঁহার মুখে একবিন্দু জলদানের জন্য হাসপাতালের ভৃত্য ও শুশ্রূষাকারিণীগণ ব্যতীত আর কেহ ছিল না। রাজপথের ভিক্ষুক ও অনাথগণের সহিত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিও পরলোকে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীদিগের পক্ষে ইহা যে চিরদিনের ঘোর কলঙ্কের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই!

যে কার্য্যের জন্য ভগবান্ মধুসূদনকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মাতৃভাষার সমৃদ্ধিসাধন করিয়া মধুসূদন বঙ্গভূমির যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে বাঙ্গালী চিরদিন স্মরণ করিবে। যতদিন বাংলা ভাষা থাকিবে, ততদিন তাঁহার স্বদেশবাসিগণ সত্যই তাঁহার কাব্য সমূহ হইতে—

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

পনর

মধুসূদনের মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ অতি সাধারণ দরিদ্রের ন্যায় সমাহিত হইয়াছিল! দেহ সমাহিত করিবার সময় কোনও ঘটা বা আড়ম্বর প্রদর্শিত হয় নাই। অর্থাভাবই তাহার একমাত্র কারণ নহে, প্রতিভার সমাদরের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। এই জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই লজ্জিত হইবার কথা। বাংলা দেশে মধুসূদনের ধনবান ভক্ত ও বন্ধুর অভাব ছিল না; তাঁহাদিগের নিকট অর্থের প্রার্থনা জানাইলে সহজেই বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিত। কিন্তু সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। ইহা যেমন মধুসূদনের দুর্ভাগ্য, তদ্রূপ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরও অগৌরব। অন্য দেশ হইলে এইরূপ একজন মহাকবির যেরূপ আড়ম্বরসহকারে সমাধিদানের কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহার গৌরবজনক বিবরণ জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত। কেবল বাংলা দেশ বলিয়াই ইহার অন্যথা হইয়াছিল! বাঙ্গালীর এই কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই!

মধুসূদনের দেহ যে স্থানে সমাহিত হইয়াছিল, সেই সমাধিস্থল বহুদিন অনাবৃত, ভগ্ন ও অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। বাঙ্গালীরা তাহার প্রতি কোনও আদর বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নাই। অবশেষে বিধাতা বঙ্গদেশকে সেই কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় মধুসূদনের সমাধির উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ

স্থাপিত হইয়াছে। বাংলা দেশের বহু ধনবান ব্যক্তি এবং দরিদ্র সে জন্য অর্থসাহায্য প্রদান করিয়াছেন। সমাধিস্তম্ভ-প্রতিষ্ঠাদিবসে বহু নরনারী তথায় উপস্থিত হইয়া অমর কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদন স্বয়ং তাঁহার যে, সমাধিলিপি রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই সমাধিস্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছে। সেই সমাধিলিপি নিম্নরূপ :

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষতীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!
—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।"

এই সমাধিস্তম্ভ হয়ত কালের ধ্বংসলীলায় একদিন তাহার কুক্ষিগত হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে অমর কবি মধুসূদনের নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। যতদিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থাকিবে, ততদিন মধুদসূনের নাম সগৌরবে বিরাজিত থাকিবে, ততদিন বঙ্গবাসী শ্রদ্ধাভক্তির সহিত কবি মধুসূদনের নাম স্মরণ করিবে।

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া মধুসূদন

কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন এবং এই জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ছাড়াও কতকগুলি নূতন বিষয়প্রবর্ত্তনের জন্যও মধুসূদন অমর হইয়া রহিয়াছেন।

অভিনয়োপযোগী প্রহসন, বিয়োগান্ত নাটক এবং চতুর্দ্দশপদী কবিতাও মধুসূদনের নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের পূর্ব্বে ইহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। মধুসূদন সে অভাব পূর্ণ করিয়া এক নূতন সম্পদের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষিত-গণের মধ্যে তিনিই প্রথম পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া নাটক এবং প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া মধুসূদন কেবল ইহাই প্রমাণ করেন নাই যে, বাংলা ভাষা সম্পূর্ণভাবেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপযুক্ত, তিনি আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাংলা ভাষা যে কোনও বিষয়রচনার পক্ষেই উপযুক্ত।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের দ্বিতীয় কার্য্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সম্মিলন। বাংলার ভবিষ্যৎ সাহিত্য যে কেবল প্রাচ্য আদর্শে বা কেবল পাশ্চাত্ত্য আদর্শে রচিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—উভয় রীতির সম্মিলনেই বাংলার ভবিষ্যৎ সাহিত্য রচিত হইবে, মধুসূদনের কাব্যে তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতীয় কবির মাধুর্য্য ও কোমলতার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য কবিগণের ওজস্বিতা সম্মিলিত করিয়া মধুসূদন বাংলা পদ্যকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছেন।

মধুসূদনের তৃতীয় কার্য্য বাঙ্গালী পাঠকের রুচিসংস্কার। এখন আর শিক্ষিতসমাজ বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কবিতা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবে না, 'মেঘনাদবধ' বাংলা সাহিত্যে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, বহু দিন পর্য্যন্ত তাহাই ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের গতি নির্ণয় করিবে। কাব্যে, নাটকে, গীতি-কবিতায়, প্রহসনে—সর্ব্বত্রই মধুসূদনের প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

মধুসূদন দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে চোখে এমনি একটা প্রীতিময় ভাব ও প্রতিভার দীপ্তি ছিল যে, লোকে তাঁহাকে দেখিলে সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল বিস্তৃত নয়নদ্বয় ও সতেজ সবল দেহ দেখিলে তিনি যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ, তাহা সহজেই অনুমিত হইত। তাঁহার দেহ নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব ছিল। প্রথম যৌবনে তাঁহার দেহ বেশ সবল ও সুগঠিত ছিল, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইয়া তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়াছিল। তাঁহার আকার-ইঙ্গিত ও প্রত্যেক কার্য্যে পুরুষোচিত ভাব ফুটিয়া উঠিত। কবিপ্রকৃতির ভাবপ্রবণতা তাঁহার প্রত্যেক বাক্যে ও প্রত্যেক কার্য্যে প্রকাশ পাইত। যৌবনাবধি তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ অটুট ছিল, কিন্তু পরে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচারিতার ফলেই সেই সবল ও সুস্থদেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। মধুসূদন যদি উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতাচারী না হইতেন, তবে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডার আরও নানাবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ করিতে পারিতেন।

আহার, আচারব্যবহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদাদিতে মধুসূদন সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাব অবলম্বন করিলেও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধ ভাব ছিল না, বরং স্বদেশকে, বিশেষতঃ তাঁহার জন্মভূমিকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন। সাগরদাঁড়ীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

একবার একটি সভাস্থলে কতকগুলি লোক তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার বৈদেশিক ভাবপ্রিয়তার জন্য দুঃখ করিলে প্রত্যুত্তরে মধুসূদন বলিয়াছিলেন, "বন্ধুগণ! আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য আপনাদিগকে দুঃখিত বা চিন্তিত হইতে হইবে না ; আমার পরিহিত কোট, বুট যদি কোনও দিন সাহেব হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তবে একবার একখানি দর্পণের দিকে চাহিলেই আমার সে ভ্রম দূরীভূত হইবে। আমার গাত্রবর্ণই আমাকে আমার জাতীয়ত্ব স্মরণ করাইয়া দিবে।"

ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত অনেকের ন্যায় তাঁহার এই ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ হইতে হইলে আচারব্যবহার ও অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের সদৃশ হওয়া আবশ্যক। তিনি বলিতেন, "আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন মুসলমান-রাজত্বে আহার্য্য, পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা প্রভৃতি ব্যাপারে মুসলমানী প্রথার অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইংরেজ রাজত্বেও আমাদের তদ্রূপ ইংরেজী প্রথার অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।"

খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে মধুসূদনের বিশ্বাস কিরূপ, তাহা জিজ্ঞাসা

করা হইলে তিনি বলিতেন, "খৃষ্টধর্ম্ম জগতে সভ্যতাপ্রচারের একটি উপায় ; কেহ ইহার প্রতিবাদে কোন কথা বলিলে আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার মানসিক প্রবণতা হিন্দুধর্ম্মেরই দিকে।"

বাস্তবিক হিন্দুভাব মধুসূদনের হৃদয়ে বিশেষভাবেই বর্ত্তমান ছিল। বিজয়াদশমী প্রভৃতি উৎসবের দিনে তিনি কখনও কখনও এক অব্যক্তভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেন।

মধুসূদন তাঁহার খিদিরপুরস্থ পৈতৃক ভবন তাঁহার কোনও বাল্যবন্ধুকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বাল্যবন্ধু মধুসূদনের জননীকে মা বলিয়া ডাকিতেন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণে মধুসূদন এই বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতিমা-দর্শনে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি অনবরত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আপনার শৈশবের ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বর্গতা জননীর স্মৃতি মনে উদিত হওয়ায় তিনি মাতার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "মা! তোমার যোগ্য পুত্র তোমার গৃহ কেমন সাজাইয়াছে! আমি তোমার অযোগ্য সন্তান, আমার দ্বারা তোমার কোনও অভিলাষই পূর্ণ হয় নাই ; আমি তোমাকে কষ্ট দিয়াছি মাত্র।"

বাঙ্গালীর হৃদয়ের মধুরতা ও কোমলতা মধুসূদনের অনেক কার্য্যে প্রকাশিত হইত। খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণের পর মধুসূদন যে দুই-একবার তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী গ্রামে গিয়াছিলেন, প্রত্যেক বারেই আত্মীয় ও প্রতিবাসিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতি মধুর ব্যবহারে তিনি সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

দেশের কোন আত্মীয় কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলে তিনি পরম যত্নে অতি মধুরভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন।

মধুসূদনের চরিত্রে নৈতিক গ্লানি যথেষ্টই ছিল, কিন্তু স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, কুটিলতা, ক্রূরতা প্রভৃতি নীচভাব কদাপি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। মধুসূদন যদি মিতাচার ও আত্মসংযমে অভ্যস্ত হইতেন, তবে যে তাঁহার পারিবারিক জীবন অতি সুখময় হইত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মনুষ্য যতই বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাবান্ হউক, ধর্ম্মভাব না থাকিলে এবং আত্মসংযম ও মিতাচার হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহার জীবন যে ভয়ানক বিষময় হইয়া পড়ে, মধুসূদন আমাদিগকে সেই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু স্কুলের খ্যাতনামা শিক্ষক স্বর্গীয় হরলাল রায় মহাশয় মধুসূদনের সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন :

"নামে মধু, হৃদে মধু, বাক্যে মধু যার,
এহেন মধুরে ভুলে সাধ্য আছে কার ?"

বর্ত্তমানে বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের একান্ত উৎসাহ ও চেষ্টায় মধুসূদনের মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে একটি সভার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তাঁহার জন্মদিবসেও তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীতে সম্প্রতি একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা যে কবির প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমাপ্ত